মেঘ পাহাড়ের গান

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

শঙ্কর প্রকাশন, কলিকাতা—৬

প্রকাশক
নিতাই মজুমদার,
শঙ্কর প্রকাশন
১৫/১এ, যুগল কিশোর দাস লেন
কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৫

মুদ্রাকর
অলোকনাথ ভদ্র
দীপালী প্রেস
১২৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা—৬

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফটো টাইপ স্টুডিও
৭২/১ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

ডাক্তার স্যুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সাহিত্য বিশারদ

জ্যেষ্ঠতাত স্মরণে

Megh Paharer Gan

A Bengali Novel by

Anil Kumar Bhattacharya

এক

তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগল কাঞ্চন—না, তপতী আসে নি। অনেক যাত্রী নামল,—তাদের মধ্যে তপতী নেই।

অথচ আজই তো আসার কথা এবং এই ট্রেনেই। মনের অস্থিরতা বেড়ে গেল কাঞ্চনের—তপতী কেন এল না! সে কী তবে ভুল দেখেছে? তারিখটা ঠিক আছে তো?

না, এত গোলমেলে লোক কাঞ্চন নয়। কিছুতেই নয়। দু-এ শূন্য কুড়ি, আর আজই তো কুড়ি তারিখ, বিশে অক্টোবর। এতে আর কোন ভুলচুক নেই। তবু মনের দ্বিধাটা যায় না। বুক পকেটেই রয়েছে নীলরঙের খামখানি। তাতে তপতীর পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা ঠিকানা। কাঞ্চনকে লেখা তপতীর চিঠি। সংক্ষিপ্ত কথা—তবু এ-কথার যেন শেষ নেই। কতবার যে কাঞ্চন পড়েছে চিঠিখানি তার আর ইয়ত্তা নেই।

তবু আর একবার পড়ে—বিশ তারিখ না হয়ে যদি বাইশ তারিখ হয়, কিংবা পঁচিশ। তাহলে আজ কাঞ্চনকে অবিশ্যি হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে। আরো একদিন আকুল প্রত্যাশা নিয়ে আবার তাকে আসতে হবে এই শিলিগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে। এই ট্রেনটির জন্যে অপেক্ষাও করতে হবে। রাত থাকতে উঠে রামবাহাদুরকে জাগাতে হবে। যা ঘুম রামবাহাদুরের! উঠতে কী চায়?

রামবাহাদুর ছাড়াও অবশ্য কাঞ্চনের চলে। আজকাল সেল্‌ফ কন্‌ফিডেন্স এসেছে তার। আত্মনির্ভরতায় এখন সুন্দর মোটর ড্রাইভ করে সে।

তবুও পাহাড়ী রাস্তা, ঝগ এবং চড়াই আর উৎরাই। রাস্তার দু'পাশে বাঁধের বালাই নেই, নিচে খাদ। একবার স্টিয়ারিং-এ হাত

স্লিপ করলেই হয়, গভীর নিচে আরোহী সমেত গাড়ি কোথায় তলিয়ে যাবে যে তার আর ঠিক্-ঠিকানা থাকবে না। তাই এতটা দুঃসাহস কাঞ্চন এখনো করে না।

আর যে রাস্তা কালিম্পং-এর! ল্যাণ্ডস্লাইড লেগেই আছে। তাই পাহাড়ী রাস্তায় পাহাড়ী ড্রাইভারই ভালো। যন্ত্র আর প্রকৃতি —উভয়ের সঙ্গে মিতালী এদের।

ভারি সুন্দর মোটর ড্রাইভ করে রামবাহাদুর। যন্ত্র তার হাতের অধীন। ভালো মেকানিকও সে। রাস্তায় গাড়ি বিগড়ালে প্রতিকারেব কৌশল তার জানা আছে।

নাঃ,—তপতী তা হলে আজ আর এল না।

যদি না আসাই সাব্যস্ত হল, তাহলে টেলিগ্রাম করে অন্তত জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তাকে না জানালেও তার বৌদিকে জানাতে পারত! এতখানি কষ্ট কবে পেট্রোল পুড়িয়ে আর তাকে শিলিগুড়ি স্টেশনে হাজির হতে হত না।

আচ্ছা, পেট্রোল না হয় পুড়ল—তাতে আর এমন কী ক্ষতি? কিছু অর্থদণ্ড, তা গায়ে না মাখলেও চলে; কিন্তু কত ভোরে উঠতে হয়েছে তাকে আসাম লিঙ্ক ধরবার জন্যে। পাহাড়ের পথে তখন শুধু কুয়াশার জাল, সারাপথ হেডলাইট জ্বলিয়ে আসতে হয়েছে।

বৌদি অবিশ্যি বারণ করেছিলেন, এত কষ্ট করে শিলিগুড়ি যাওয়ার কীই বা দরকার! স্টেশনে তো গাড়ির অভাব নেই। তপতী একলাই চলে আসবে। এ বাড়ি তো তার অজানা অচেনা কিছু নয়।

কিন্তু তাই কী হয়? একটা মর্যাদা আছে তো তপতীর!

তবু তপতী এল না।

চিঠিটা তাহলে লিখল কেন? দুর্ভাবনার কাঁটা যেন মনটায় খচ্ খচ্ করে বিঁধতে লাগল কাঞ্চনের।

পথে কোন বিপদ হল না তো? কাকেই বা জিজ্ঞেস করে।
কলকাতা থেকে আসাম লিঙ্ক বেশ স্বচ্ছন্দে এসেছে তো ?

রেলওয়ে প্ল্যাটফরমের এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল কাঞ্চন,—যাত্রীরা এতক্ষণ সবাই চলে গেছে। যায়নি শুধু একজন, হাতের সুটকেসের সঙ্গে যার ছোট্ট একটি বেডিং বাঁধা। শিলিগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে যে দূরের ধূসর হিমালয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে আত্মনিমগ্ন হয়ে আছে।

শুনছেন ?—কাঞ্চন ডাকল।

সে-ডাকের কোন প্রত্যুত্তর নেই। কাঞ্চনের কাছে এ তন্ময়তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। অমন হাঁ করে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকার অর্থ কী ? এরপর তো গাড়ি পাওয়াই মুশকিল হয়ে পড়বে।

পাগল নাকি ?—কাঞ্চন ভাবল মেয়েটির দিকে তাকিয়ে। সুটকেস আর বিছানাপত্তর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্টও কী ছাই হচ্ছে না ? একটা কুলি পর্যন্ত ডাকেনি। আচ্ছা মেয়ে তো !

শুনছেন ?—কাঞ্চন এবার জোর গলায় চেঁচিয়ে বলল।

মেয়েটি ফিরে তাকাল, আমাকে বলছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কী বলুন।

কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা জিগ্যেস করি।

কী বলুন না।

আপনি কী এই লিঙ্ক এক্সপ্রেসে এসেছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কলকাতা থেকে ?

হ্যাঁ।

ট্রেনটা বেশ নিরাপদে এসেছে ? রাস্তার কোন এ্যাকসিডেন্ট হয়নি তো ?

না। কেন বলুন তো ?

কাঞ্চন বলল, আমার এক আত্মীয়ার এই ট্রেনেই আসার কথা ছিল কিনা, তাই।

ও। তা, তিনি বুঝি আসেন নি? প্রশ্ন করলে মেয়েটি।

না। তাই ভাবনা হচ্ছে।

হয়ত কোন কাজে আটকে পড়ে গেছেন তাই আসতে পারেন নি।

কাল চিঠি পেয়েছি তাঁর—এই ট্রেনেই আসবেন জানিয়েছেন। হঠাৎ কী এমন কাজ এসে আটকে দেবে? তা নয়।

কাঞ্চনের কথায় স্মিত মুখে মেয়েটি বলল, কিংবা ট্রেন ফেলও তো করতে পারেন।

এতক্ষণে একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া গেল। কথাটি বুঝি কাঞ্চনের মনে ধরেছে, তা যা বলেছেন! তা হতে পারে। যা অলস মেয়ে সে। আটচল্লিশ ঘণ্টায় তার দিন হয়, এমনি স্পীড।

তবে তাই হবে।—মেয়েটি এ-প্রসঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিল।

কাঞ্চন তবুও কেন নিরস্ত হয় না? মনের সংশয় এখনো বুঝি কাটেনি তার। কি যেন ভেবে বললে, তা হলে তো আর্জেন্ট টেলিগ্রাম একটা করতে পারত! সে নিশ্চয়ই জানে, বৌদি কত ভাববেন তার না আসার জন্যে। আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলেন।

কাঞ্চনের ছেলেমানুষী কথায় মেয়েটি হেসে উঠল।

আপনি হাসছেন?—জানেন না, আমার বৌদি কত নার্ভাস।

অনুমান করতে পারি। কিন্তু আরো বেশি করে জানলাম—আপনি তাঁর চেয়েও বেশি নার্ভাস। ভাববেন না। বাড়ি ফিরে গিয়েই খবর পাবেন তাঁর। এতক্ষণে নিশ্চয়ই টেলিগ্রাম পৌঁছে গেছে।

মেয়েটির কণ্ঠে নিশ্চয়তার সুর। তারপর ফের বলল,

আচ্ছা, আমি তবে চলি। নমস্কার।—মেয়েটি মাথা নত করল। ডান হাতে সুটকেস আর বেডিং, বাঁ হাতে একটি গরম ওভারকোট ঝোলানো। দু'হাত যুক্ত করে বিদায়-অভিবাদন জানাবার তাই হয়ত উপায় নেই।

এতক্ষণে কাঞ্চনের স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। নিজের ব্যবহারে সে লজ্জিত হয়ে ওঠে। ছি ছি, ভদ্রমহিলার প্রতি অত্যন্ত অসৌজন্য প্রকাশ করেছে সে। মোটঘাট নিয়ে কত কষ্টই না পাচ্ছেন!

কাঞ্চন কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, ক্ষমা করবেন! দিন মাল-পত্তরগুলো আমার হাতে। স্টেশনে কুলি পাননি বুঝি?

প্রত্যুত্তরে মেয়েটি জানাল, ধন্যবাদ। সামান্য জিনিস। মোটেই ভারি নয়। আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। এর জন্যে আর কুলি ডাকবার দরকার বোধ করিনি।

তবুও। বিশ্রি লাগছে আমার। দিন, মাল-পত্তরগুলো আমার হাতে।

সে কী?

কিন্তু করবার কিছু নেই এতে।

আমার জিনিস আপনি বইবেন কেন?

যেহেতু আপনি একজন মহিলা। এটা নিতান্তই সাধারণ ভদ্রতা-বোধ।

কাঞ্চনের এ-কথায় মেয়েটি বলল, তা বলে অপরেরই বা বোঝা হবো কেন?

দিন তো ওগুলো। কথায় অনর্থক কথা বাড়ে—কাঞ্চন বেডিং-বাঁধা স্যুটকেসটি ছিনিয়ে নিলো মেয়েটির হাত থেকে।

এ কী!

বেয়াদফি মাপ করবেন। এটা অশিষ্ট আচরণ বলে মনে করবেন না। সামান্য একটু সাহায্য করা। অনেকক্ষণ ধরে বোঝাটি বইছেন। আর যেহেতু আপনি একজন ভদ্রমহিলা—

কাঞ্চনের কথায় মেয়েটির সংকোচ কেটে গেল।

কোথায় যাবেন?

দার্জিলিঙে।

কোন আত্মীয়ের বাড়ি?

না, সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায়।

একলা ?

দোকলা আর কোথায় পাবো বলুন।

তা হলে দার্জিলিঙে উঠবেন কোথায় ? লুইস্ স্যানাটোরিয়ামে ? না, অন্য কোন হোটেলে।

যেখানে জায়গা পাবো। কোথাও না পাই তো ধর্মশালায়।

মেয়েটির বেডিং বাঁধা সুটকেসটির ওজন বড় কম নয়। একটুখানি চলতে না চলতেই কাঞ্চন্ তা অনুমান করতে পারল। অথচ এক্ষেত্রে কুলি ডাকাও যায় না—পুরুষের পৌরুষে তাতে আঘাত লাগে।

কাঞ্চনের বিস্ময়বোধ হয়,—আচ্ছা মেয়ে তো! এই ভারি মোট-বহর দিব্যি এতক্ষণ বইছিল।

অনেকক্ষণ ধরে মনিবের দেখা না পেয়ে ড্রাইভার রামবাহাদুর স্টেশনের প্ল্যাটফরমের দিকেই এগিয়ে আসছিল। কাঞ্চন তাকে দেখে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। ভারি বোঝাটি তার হাতে তুলে দিয়ে অতঃপর সে নিশ্চিন্ত হল এইবারে একটু সুস্থ এবং নিশ্চিন্ত মনে কথা বলা যাবে ভেবে।

মেয়েটি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা, আপনার নাম কী কাঞ্চন রায় ?

বিস্ময়ের অবধি রইলো না কাঞ্চনের। বলল, হ্যাঁ। আপনি জানলেন কেমন করে ?

আপনাদের বাড়ি কী বালিগঞ্জে পাম এ্যাভেন্যুতে ?

কী আশ্চর্য! কেন বলুন তো ?

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল মেয়েটি।—তা হলে তো ঠিকই চিনেছি। অনেকক্ষণ ধরেই আপনাকে পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না যে কোথায় দেখেছি।

তা কোথায় দেখেছেন আমাকে ? কাঞ্চন জিগ্যেস করল।

আপনি তো সুস্মিতার দাদা

হ্যাঁ। সুস্মিতা আমার কাজিন। মাসতুতো বোন।

দেখুন, তা হলে ঠিকই চিনেছি।

হ্যাঁ, আপনার স্মরণশক্তির তারিফ করি। কিন্তু আপনি তো আমাকে বিপদে ফেললেন দেখছি।

কিসের বিপদ?

আপনাকে চিনতে না পারার বিপদ?

ও, এইমাত্র? তা নাই বা চিনলেন!

কাঞ্চন সত্যিই লজ্জা পেয়ে গেল। যিনি তার সম্পর্কে এতখানি জানেন—নাম, ধাম, এমন কি গোত্র পর্যন্ত; তাঁকে সম্পূর্ণভাবে না চিনে ছেড়ে দেওয়া চরম অভদ্রতা।

কাঞ্চন বলল, কিছু মনে করবেন না। স্মরণশক্তি সত্যিই আমার দুর্বল, তাই বি. এস-সি. পরীক্ষায় অনার্স পেলাম না।

মেয়েটি স্মিতমুখে বললে, এত ভালো স্মরণশক্তি থাকা সত্ত্বেও আমার পক্ষে আরো লজ্জার কথা যে আমি একবার ফেল করে তবে বি. এ. পাশ করেছি। তাও অনেক কষ্টে—কোনরকমে পাস-কোর্সে।

শিশুর মতন হাততালি দিয়ে উঠল কাঞ্চন, ব্র্যাভো! আমাদের দু'জনের মধ্যে কী চমৎকার মিল দেখুন তো! প্ল্যাটফরমের বাইরে আসা গেছে। আলাপটা আরেকটু ভালো করে জমুক না কেন! চলুন, একটু কফি খাওয়া যাক্! সারারাত ট্রেনে কাটিয়েছেন। নিশ্চয়ই ক্লান্তি জাগছে।

নিশ্চয়ই নয়। তবুও এক পেয়ালা কফিতে আপত্তি নেই। ভীষণ আনন্দ পাচ্ছি। ভারি নতুন লাগছে আজকের দিনটিকে।— উচ্ছ্বাসের আধিক্যে একসঙ্গে অনেকগুলি কথা বলে ফেললে মেয়েটি।

কাঞ্চন রামবাহাদুরকে মাল-পত্তর গাড়িতে রেখে দিতে বলে তাদের জন্য অপেক্ষা করবার আদেশ দিল। তারপর নবসঙ্গিনীকে নিয়ে

রিফ্রেশমেণ্টরুমে গিয়ে ঢুকল। ওয়েটারকে ডেকে কফির সঙ্গে কিছু টুকিটাকি খাবারের অর্ডার দিয়ে সে মেয়েটিকে জিগ্যেস করল,

লজ্জার মাথা খেয়েই জানতে চাইছি—আপনার নাম?

রাগিণী চ্যাটার্জী।

কোথায় থাকেন?

আপাতত কলকাতায়—পার্কসার্কাসে।

আদি বাড়া?

ঢাকা, বিক্রমপুর।

তাই এত বিক্রম আপনার।

কিসে বুঝলেন?

যে ভারি মোট অনায়াসে বইছিলেন। আর—

আর কী?

আর একলা যে-ভাবে শৈলবিহারে বেরিয়েছেন!

এতে কী খুব বিক্রমের প্রয়োজন হয়?

হয় না?

ওয়েটার গরম কফিপট আর বিস্কিট এবং প্লেটে কিছু নাট রেখে গেল। খিদে রাগিণীর অবশ্যই পেয়েছিল, সেই কোন সকালে বাড়ি থেকে হু'টি ভাত খেয়ে বেরিয়েছে! তারপর সত্যিকারের খাওয়া আর তেমন কিছু হয়নি। ইচ্ছে করছিল গো-গ্রাসে খায়, কিন্তু লজ্জা এসে বাধা দিল।

কাঞ্চন বলল, নিন, আরম্ভ করুন। আমার পক্ষে নাট, বিস্কিট আর এক পেয়ালা কফিই যথেষ্ট। কিন্তু আপনার আরো কিছু খাওয়া দরকার। নিন মেনু, যা খুশি অর্ডার দিন।

রাগিণী লজ্জা পেল। বললে, আমার পক্ষেও এই যথেষ্ট।

কাঞ্চন প্রতিবাদ জানাল, তা হয় না। সমস্ত রাত ট্রেনজার্নি।

রাতের জন্যে অনেক খাবার এনেছিলাম সঙ্গে করে। সব খেয়ে ফেলেছি।

হ্যাঁ। তা অবিশ্যি অনুমান করতে পারি। আর এও জানি হঠাৎ-পাওয়া বন্ধুর জন্যে কিছুই আর অবশিষ্ট রাখেন নি।—হো হো করে কাঞ্চন হেসে উঠল।

রাগিণী বলল, আপনি সুরসিক।

সে কথার আর কোন উত্তর না দিয়ে কাঞ্চন ওয়েটারকে ডেকে ডিমসিদ্ধ আর টোস্টের অর্ডার দিল।

কফিপট থেকে পেয়ালায় কফি ঢালতে যাচ্ছিল কাঞ্চন।

রাগিণী বাধা দিল, এটা আমাদের কাজ। বিক্রমপুরের মেয়ের বিক্রমের পাশে এ-ব্যাপারে কিন্তু হার মানতে হবে আপনাকে।

দু'জনেই এ-কথায় একসঙ্গে হেসে উঠল। পেয়ালায় উত্তপ্ত কফির লিকার ঢেলে তাতে দুধ মিশিয়ে চিনির চামচটাকে তুলে নিয়ে রাগিণী জিগ্যেস করল, ক'চামচ?

যে ক'চামচ ইচ্ছে।

অর্থাৎ?

মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। ইতরজন কিনা, তাই মিষ্টি খেতে ভালোবাসি।

রাগিণী হেসে ফেললে, চমৎকার কথা বলেন আপনি।

কাঞ্চন বলল, আপনার কম্প্লিমেণ্টে খুশি হলাম। আপনার কণ্ঠস্বরের সঙ্গেও আপনার নামের কিন্তু খুব সুন্দর মিল আছে।

ধন্যবাদ! ফিরতি জবাব দিল রাগিণী।

আচ্ছা, সুস্মিতাকে চিনলেন কেমন করে?

কিছুদিন আমরা একই কলেজে পড়েছিলাম। লেডী ব্র্যাবোর্ণে।

ও। আর আমাকে?

একদিন সুস্মিতার সঙ্গে আপনাদের পাম-এ্যাভেন্যুর বাড়িতে গিয়েছিলাম।

ও, এইবার মনে পড়ছে বটে। ইয়েস্—উৎফুল্ল হয়ে উঠল কাঞ্চন। আমার নাম কাঞ্চন শুনে ঠাট্টা করেছিলেন সেদিন।

ঠাট্টা করিনি। বরঞ্চ প্রশংসা করেছিলাম। আর আপনার গায়ের যা রঙ, তাতে নামের সার্থকতা চোখে পড়ে।

তাই নাকি?

কেন, আপনি কী নিজেই জানেন না তা।

নিজের চেহারা কী নিজে টের পাওয়া যায়?

অপরের মুখেও তো শোনেন আর আর্শিতে নিশ্চয়ই নিজের চেহারা দেখেন।

তবু আপনার মুখ থেকে আজ আবার তা শুনে খুশি হলাম।

কাঞ্চনের এ-কথায় রাগিণীর হাতের কফির পেয়ালা একটু কেঁপে উঠল,—আর একটু হলেই কফির লিকার চল্‌কে পড়ত তার শাড়িতে। খুব সামলে নিয়েছে সে।

কথার মোড় ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গে আসতে হল এইবার—সুস্মিতা এখন কী করছে? বহুকাল আর তার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই।

ঘর-সংসার। ছেলে-পিলের মা। রীতিমত গৃহিণী যাকে বলে আর কী।

বাই জোভ্! কোথায় বিয়ে হয়েছে তার? স্বামী কী করেন? ছেলেমেয়ে ক'টি?

কাঞ্চন রাগিণীর কথায় বাধা দিয়ে বলল, দাঁড়ান, দাঁড়ান। খেই হারিয়ে যাবে। একটা একটা করে প্রশ্ন করুন।

আচ্ছা, একটা একটা করেই তা হলে উত্তর দিন।

সুস্মিতা এখন কোথায় আছে?

তার শ্বশুরবাড়ি। কলকাতাতেই।

কলকাতার কোন জায়গায়?

নিউ আলিপুরে।

আর তার স্বামী?

তার স্বামী সরকারী একটা ব্যাঙ্কের বড় সাহেব। অর্থাৎ ম্যানেজার। কলকাতাতেই পোস্টেড এখন।

কতদিন হল বিয়ে হয়েছে ?

তিন বছর।

ক'টি ছেলে মেয়ে ?

একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।

শুনে সুখী হলাম।

আব আপনি ?—জিজ্ঞাসু নয়নে রাগিণীর দিকে তাকিয়ে কাঞ্চন প্রশ্ন করল।

শুধু কেরানি।

কোন অফিসে ?

সরকারি হিসেবনিকাশ দপ্তরে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন তাই সিনিয়র গ্রেড পেয়েছি।

আর—

কাঞ্চনের প্রশ্নকে মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে রাগিণী বললে, আর সিঁথের দিকে লক্ষ্য করে নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে সিঁদুর পরবার সৌভাগ্য থেকে এখনো বঞ্চিত আছি।—কিন্তু আপনার কথা কিছুই শুনলাম না এখনো। অথচ এতক্ষণের আলাপ—

আমার কথা ?

হ্যাঁ।—তির্যক দৃষ্টিতে রাগিণী কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, যাঁর জন্যে আজ শিলিগুড়ি রেলস্টেশনে অধীর অপেক্ষায় ছিলেন, তিনি বুঝি ?

আজ্ঞে না। তিনি হচ্ছেন আমার বৌদির কাজিন। মামাতো বোন আর কি।

তাহলে তো ভারি মিষ্টি সম্পর্ক !

না, যতখানি মিষ্টি বলে মনে করছেন ঠিক ততখানি মিষ্টি তিনি নন। অম্লমধুর বলতে পারেন। আজ তাঁরই আসবার কথা ছিল।

তাঁর বদলে কিন্তু আমি এলাম।

হ্যাঁ, নাকের বদলে নরুণ আর কী !

কফি-পানের পর্ব শেষ হল। পাওনা চুকিয়ে দেবার সময় রাগিণীই তার মানিব্যাগ খুলতে যাচ্ছিল, আমি দিচ্ছি।

তার মানে?

মানে আর কিছুই নয়। খিদেটা আমারই পেয়েছিল বেশি।

কাঞ্চন বাধা দিল, রিফ্রেশমেণ্টরুমে আমিই কফি খাওয়ানোর জন্যে নিয়ে এসেছি। আপনি আমার গেস্ট।

খাবারের বিল কাঞ্চনই চুকিয়ে দিয়ে বললে, চলুন এইবার।

রাগিণী জিগ্যেস করল, কোথায়?

কালিম্পং।

কালিম্পং কেন? আমি তো যাবো দার্জিলিং।

হেসে কাঞ্চন উত্তর দিল, ওই একই কথা। যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপান্ন।

রাগিণী বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে কাঞ্চনের দিকে তাকাল, তার মানে?

সহজ সবল কণ্ঠে কাঞ্চন বলল, মানে আবার কী? কালিম্পং বেড়িয়ে তারপর দার্জিলিঙ যাবেন। দেখবেন, দার্জিলিঙ থেকে কালিম্পংই আপনার বেশি ভালো লাগবে।

কেন?

কালিম্পং-এর প্রকৃতি আরো সোবার। ক্লাইমেট অনেক ভালো। শীত অনেক কম। আর অজস্র ফুল। ফুলের দেশই বলতে পারেন। বন আলো করে আছে কমলালেবু।

তবে কালিম্পং-এ না গিয়ে দার্জিলিঙে এত লোক আসে কেন?

দার্জিলিং শুধু শো। বড়লোকদের বেড়াবার বাবুয়ানি জায়গা।

কেন কাঞ্চনজঙ্ঘা? মেঘ আর পাহাড়?

রাগিণীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কাঞ্চন বলল, কালিম্পং-এ সে দৃশ্য আরো ভালো দেখবেন।

কথায় কথায় দু'জনে এসে স্টেশনের বাইরে মোটর-স্ট্যাণ্ডে

পৌছাল। ঝকঝকে একখানি মোটর কার থেকে নেমে রামবাহাদুর সেলাম জানিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

কাঞ্চন বলল, উঠুন।

খানিকটা থমকে দাঁড়াল রাগিণী।—তা কি করে হয়?

স্মিত মুখে কাঞ্চন বলল, কেন, কুণ্ঠা কিসের? এতক্ষণ তো দেখলেন, খুব মন্দলোক বলে মনে হল কী আমাকে?

না, তা নয়। আপনার সম্পর্কে কোন কুণ্ঠা নেই।

তবে আবার কী? আপনার পক্ষে তো কোন অসুবিধে নেই। ভাবনা বরং আমার। শাস্ত্রে বলেছে—অজ্ঞাতকুলশীলস্য···

সেইটেই তো প্রকাণ্ড বাধা। আমাকে না জেনে শুনেই—

বিলক্ষণ! শাস্ত্রবাক্য তো অমান্য করিনি। আপনি তো আর অজ্ঞাতকুলশীলা নন। আপনি আমার বোন সুস্মিতার বন্ধু।

কিন্তু আপনার বাড়ির সব? বিশেষ করে আপনার বৌদিই বা কী মনে করবেন?

কিচ্ছু নয়। বরং অত্যন্ত খুশি হবেন তাঁর ননদের বন্ধুকে দেখে।

তবু কিছুক্ষণ কী যেন ভাবতে থাকে রাগিণী।

কাঞ্চন বলল, আর ভাবনায় কাজ নেই। আপনার ভাবনাটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। আর আমার দিকের ভাবনা আমি কি না ভেবেই আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি?

আমার সম্পর্কে কোন ভাবনা কিংবা আপত্তি অবশ্য যদি আপনার কিছু থাকে তা হলে—

বিলক্ষণ! আপনার সম্পর্কে আবার আমার আপত্তি কিসের?

সো নাইস! উঠুন, উঠুন, আর দেরি নয়। দেখবেন, কালিম্পং কী সুন্দর জায়গা। আমাদের বাড়িটিও আপনার আশা করি ভালোই লাগবে। আর তা ছাড়া কালিম্পং থেকে দার্জিলিঙ কাছেই। যখন খুশি চলে যেতে পারবেন।

মোটরে উঠে বসল রাগিণী। পিছনের আরামদায়ক সীট। কাঞ্চন সোফারের পাশেই বসতে যাচ্ছিল। রাগিণী বাধা দিয়ে বলল, ও কী, ওখানে বসছেন কেন?

ওটা লেডিস্ ওনলি!

উচ্চকিত হাসিতে দুলে উঠল রাগিণী, কই, তাতো কিছু লেখা নেই এখানে।

সব লেখাই কী চোখে পড়া যায়?

হেঁয়ালি থাক্। আসুন এখানে।

পারমিশন দিচ্ছেন তা হলে?

পিছনের দিকে সীটে এসে বসল কাঞ্চন।

মোটর স্টার্ট নিল। পিচ ঢালা সোজা রাস্তা। শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে সেঙকের পথে গাড়ি ছুটে চলল। হেমন্তের উদ্ভাসিত রৌদ্র। পথের দুধারে অরণ্য শোভা।

চুপ করে বসেছিল রাগিণী। ভাবছিল আকস্মিক এই ঘটনার কথা। এ যেন এক কাল্পনিক নভেল। ঘটনা থেকে দুর্ঘটনায় না আবার পড়ে! না, সে আশঙ্কা নেই। কাঞ্চনকে তার চেনা হয়ে গেছে। তার সম্পর্কে কোন আশঙ্কার কারণ নেই। ভাবছিল, কাঞ্চনের বাড়ির কথা। অপরাপর সব পরিবার পরিজনবর্গ—বিশেষ করে কাঞ্চনের বৌদির কথা। কাঞ্চনের ব্যবহার অত্যন্ত মার্জিত এবং প্রীতিপদ সন্দেহ নেই; কিন্তু তবুও—তবুও কোথায় যেন একটা ঘন সংকোচের আবরণ।

নাঃ, সে-সঙ্কোচকে কাটিয়ে উঠবে রাগিণী। সে তো আর কচি খুকিটি নয়, আর অত অপরিণত মনও তার নয়। পুরুষ সম্পর্কে বিশেষ কোন দুর্বলতা তার নেই। শাস্ত্রে বলে—আগুন আর ঘি। এ-যুগে এ মতবাদ অচল। কর্মের জীবনে আজ পুরুষ এবং নারীতে প্রভেদ বড় কিছু নেই। অসঙ্কোচে নিত্য নব নবীন পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের মেলামেশা একালে আর নিন্দনীয় নয়। পুরুষকে যেমন বনের

বাঘের মতন ভয় করত নারী, আর নারীকে যেমন সোনার পিঞ্জরে আবদ্ধ করে রাখা হত এই কিছুদিন আগে, আজকের দিনে তার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে।

ট্রামে, বাসে, পথেঘাটে, সিনেমায়, ট্রেনে—এখন পুরুষ আর নারী পাশাপাশি চলেছে। সর্বক্ষেত্রেই অবাধ গতি।

সঙ্গিনী তখনকার দিনে ছিল না—বান্ধবীও ছিল না। নারী ছিল শুধুমাত্র গৃহিণী। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবলা—সংসারের জোয়াল কাঁধে ভারবাহী জীব। ভাতকাপড়ের দাসীও বা।

এখন কিন্তু নারীর সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা। নারী আর পুরুষ এক। সঙ্গিনী, বান্ধবী, সহকর্মিণী—কত রকমের সংজ্ঞাই না দেওয়া চলে।

কাঞ্চনের সঙ্গে ক'দিনের জন্যে না হয় বন্ধুত্বই হল তার। বন্ধুর ভবনে পুরুষ সখার সঙ্গে সখী নারীর সখ্যতা। এতে আর এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবার ভয়টা কিসের ? ক্ষতিই বা কী ?

না, ক্ষতি কিছু নেই, বিপদকালে নিজের সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখার মতন ক্ষমতা বিক্রমপুরের মেয়ে রাগিণীর আছে।

তবে ?

বরঞ্চ স্বল্পবিত্তের পক্ষে শৈল-আবাসে ক'দিন বিনা খরচে বিত্তশীলের আতিথ্যলাভ সৌভাগ্যেরই কথা।

রাগিণী স্বচ্ছন্দ হল।

দুই

ক'দিনের জন্যে বেড়াতে বেরিয়েছে রাগিণী।

আর এমন হামেশা বেড়াতে বেরোনোর অবস্থা বা অবকাশ কই তার? অথচ তার সহকর্মী এবং সহকর্মিণীরা প্রায়ই যাচ্ছে। তাও কী সব কাছাকাছি জায়গায়? কাশ্মীর, কন্যাকুমারিকা, কুলু-মানালী, বোম্বে, গোয়া, উটকামণ্ড, শিলঙ্, নেপাল—কোথায় নয়? কত দূর দূরান্তের পথ। কত কত ভ্রমণ-কথা রাগিণী শোনে তাদের মুখ থেকে। মন তারও ছুটে চলে সেইসব দূর দূরান্তের পথে। কিন্তু তার পক্ষে হুট করে বাইবে বেরুনো অত সোজা ব্যাপার নয়।

এবার সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। কোন বাধাই মানবে না সে আর। পূজোর পর দীপালির ছুটির সঙ্গে আরো কয়েক সপ্তাহ অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বসল সে। আর দার্জিলিঙের হিল কনসেশনের রেলের রিটার্ণ জার্ণির টিকিটও কিনে ফেলল পূর্বপশ্চাৎ কিছু না ভেবে চিন্তেই।

ঘটা করে চারদিকে প্রচার করল অতঃপর শৈল বিহারের কথা।

সরকারি দপ্তরে সিনিয়র গ্রেড কেরানী, শুনতে ভালো বেশ। কিন্তু ক'টাকাই বা আর আয়? ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না।

আর কত পোষ্যই না প্রতিপালন করতে হয় তাকে! মা-বাপ, ভাই-বোন—এককথায় জাজ্জ্বল্যমান সংসার। মাত্র পঁচিশ বছব বয়সে সেই সবার অভিভাবিকা।

ঢাকা বিক্রমপুরের মেয়ে সে। কাঞ্চন ঠিকই বলেছে, বিক্রম তার আছে বৈ কি!

তার বাবা জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন। দেশ বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় সেখানকার তল্পিতল্পা উঠিয়ে কলকাতায় এসে আশ্রয় নিতে

হয়েছে। বিক্রমপুরে বসবাসকালে পূর্ববঙ্গের এক জমিদারী কাছারির চাকরিতে তবু যা হোক কিছু আয় ছিল তাঁর। আর সেই আয়েতেই এতদিন কষ্টেসিষ্টে সংসার চলেছে। কিছু জমি-জায়গা বিষয়-আশয় অবিশ্যি ছিল। তার জন্যে মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হয়নি।

কলকাতায় এসে বাইশ বাঁক জলের নিচে পড়লেন রাগিণীর বাবা। চাকরি নেই। দেশের সম্পত্তি ভিন্নরাষ্ট্রে বেদখল হয়ে গেছে। ছেলে ছু'টির মধ্যে একটিও মানুষ নয়। বড়টি বাজারের পয়সা মেরে প্রায় নিত্যই হিন্দি সিনেমার টিকিট কেনে, বিড়ি ফোঁকে আর লারে-লাপ্পা গান গেয়ে বেড়াত এতদিন। বড় মেয়ে রাগিণীই একমাত্র ভরসা। অনেকজনকে অনেক ধরাধরি করে সম্প্রতি রাগিণী এই ভাইকে একটা ওয়ার্কশপের কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। সংসারের তাতে এই লাভ যে সোমত্ত ছেলে নিজের খরচ নিজে চালাতে পারে এখন।

ছোট ছেলেটি স্কুলে পড়ছে। পড়ছে না ছাই! পড়াব নামে বখামি করছে।

রাগিণীর ছুই বোন এদিক থেকে বরঞ্চ ভালো। তাদের দিকেই এখন তার সতর্ক দৃষ্টি। তারা মানুষ হলে তবু খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে সে।

বাপের আক্কেল বিবেচনা কিছুই নেই। বয়েস ষাটের কাছাকাছি হল; কিন্তু লজ্জার কথা পিতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা এখনো যায় নি তাঁর। মা আবার এই বয়সেও অন্তঃসত্ত্বা। সংসারের ভারী জোয়াল রাগিণীরই স্কন্ধে। পঁচিশ বছরের মেয়ে এই বোঝা বহন করে চলেছে।

তবু ভাগ্যিস্ দূর সম্পর্কের এক মাসি ছিলেন। বাপের সংসার বিক্রমপুর থেকে কলকাতায় পার্ক সার্কাসে নিজের কাছে এনে বোনঝি রাগিণীকে তিনিই লেখা-পড়া শিখিয়েছিলেন। তাই কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করেছে রাগিণী। আর অনেক তোড়-জোড় করে গভরমেণ্টের দপ্তরখানায় সিনিয়র গ্রেড কেরাণীগিরিও পেয়েছে নিতান্তই ভাগ্যের জোরে।

মোটরের স্পীড কমে গেল।

দেখুন, কী চমৎকার দৃশ্য সেবকের! এবারের বর্ষার জলের বেগ এখনো কমে নি কিন্তু।

কাঞ্চনের কথায় রাগিণীর চমক ভাঙে।

সত্যিই সুন্দর দৃশ্য! সেবকের ব্রীজে উঠতে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে রাগিণী—তর তর করে নদীর জল বয়ে চলেছে। দূরেব হিমালয় অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে।

এ পথে কী এই প্রথম আসছেন?

হ্যাঁ। কাঞ্চনের কথার সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে রাগিণী আবার আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রইল।

মাসিমা আর নেই।

তবু সৌভাগ্য যে তিনি তাকে মানুষ করে দিয়ে গেছেন। ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দেবেন এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। বিয়ে দিয়ে যেতে পারলেন কই? আরো দুর্ভাগ্য যে কোন ব্যবস্থাই তিনি তার জন্যে করে যেতে পাবেন নি।

হঠাৎ মারা গেলেন মাসিমা।

সুস্থ মানুষ। পাঁচ মিনিট আগেও হেসে রাগিণীর সঙ্গে তাব বিয়ের সম্পর্কে কথাবার্তা বলছিলেন। তারপর কী যেন হল। বুকে অসহ্য বেদনা, দম আটকে আসছে। কথাবার্তা একেবাবে বন্ধ হয়ে গেল।

রাগিণীই ছুটল ডাক্তাব ডাকতে। পাড়াব মধ্যেই ডাক্তার,—এমন কিছুই দেরি হয়নি, কিন্তু তর সইল না।

মাথা নিচু করে ডাক্তার বললেন, অল রেডি একস্‌পায়ার্ড। করোনারি হার্ট অ্যাটাক্।

শেষ। সব শেষ। শুধু একটি রমণী-জীবনের অবসান নয়,—তার সঙ্গে আর একটি আশ্রিতা তরুণী-জীবনেরও সব আশা-আকাঙ্ক্ষা অবলুপ্তি।

জীবন আর মৃত্যু। বয়েস মাত্র বাইশ বছর। তারই মধ্যে রাগিণী চিনতে পারল পৃথিবীকে। কী শক্ত মাটি এখানকার!

মাসির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হল তাকে চিরদিনের মতন। নিঃসন্তান মাসি, কিন্তু নিজের ভাসুর-পোই বাড়ির মালিক। রাগিণীর এতদিনকার দাবি নিছক শুধুই ফাঁকি।

তবু কপাল ভালো, তাই না সেই সময়েই এমন একটা সরকারি অফিসে চাকরি জুটে গেল। তার মতন পাশ-কোর্সে বি-এ পাশ করা মেয়ে কলকাতা শহরের অলিতে-গলিতে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চাকরি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পার্ক সার্কাসেই এক বাড়িতে এক-তলায় দু'খানি ঘর শস্তায় ভাড়া পাওয়া গেল, আর পাকিস্থানের মায়া কাটিয়ে সমস্ত সংসারটি ঘাড়ে চেপে বসল তার।

একেই বলে—অদৃষ্ট!

কী ভাবছেন বলুন তো?—কাঞ্চন প্রশ্ন করল।

ঘুম থেকে যেন জেগে উঠল রাগিণী। বললে, না, কিছুই নয় তো।

মাথা নেড়ে কাঞ্চন বলল, না। ঠিক বললেন না। কিছু যেন চেপে যাচ্ছেন। আমার বাড়িতে এমন ভাবে যাওয়াতে হয়ত সঙ্কোচ বোধ করছেন। কিংবা ভয় পাচ্ছেন।

সঙ্কোচ বোধ অবশ্যই করতে পারে রাগিণী। কিন্তু ভয়? ফুঃ, বিক্রমপুরের মেয়ের করবে ভয়? এ আর এমন কী? কত ভীষণ ভয়কে জীবনপথে অতিক্রম করে এসেছে সে। ভয় পাবার মেয়ে অন্তত রাগিণী নয়। আর কাঞ্চনের মতন এমন ছেলেকে দেখে? হাসি পায় রাগিণীর।

বিক্রমপুরের মেয়েকে শেষকালে এই চিনলেন?

রাগিণীর কথায় কাঞ্চন বলল, না। সত্যি, আমি আপনাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছি। আর সেজন্যেই আমার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে

আনন্দ পাচ্ছি। আমার বাড়িতে নিশ্চয়ই কোন অযত্ন হবে না এ-কথা বেশ হলপ করেই বলতে পারি।

তা অস্বীকার করছে কে?

তবে অমন গম্ভীর হয়ে গেছেন কেন?

নিজেকে ঢেকে নেয় রাগিণী, সমস্ত রাত জেগেছি তো। তাই একটু ক্লান্তি বোধ করছি।

রাগিণীর কথায় আশ্বস্ত হয় কাঞ্চন। আরো জোর দিয়ে বলে, সত্যিই, কোন অসুবিধেই হবে না আমাদেব বাড়িতে। দেখবেন, বৌদি খুব খুশি হবেন আপনাকে দেখে। সুস্মিতাব বন্ধু। পর তো নন!

আপনার মতন আমি অত ফেনিয়ে ফেনিয়ে ভাবিনে। এ বিশ্বাস আমার নিশ্চয়ই আছে যে আপনার বৌদি একজন মহিলাকে বাড়ির বার করে দেবেন না অন্তত। তাঁর ননদ সুস্মিতার বন্ধু না হলেও দু'চারদিনের অতিথির প্রতি বিমুখতা তাঁর নেই।

রাগিণীর কথা শুনে স্মিত মুখে কাঞ্চন বলল, আমার বৌদি সম্পর্কে এতখানি ধারণা আপনার। তাঁকে না দেখেই?

হ্যাঁ। শুধু আপনার বৌদি কেন? বাংলাদেশের সব বৌদি সম্পর্কেই আমার ধারণা একই রকমের।

কেন, মহিলা বলে?

হ্যাঁ। মেয়েদের এটা মেয়েপ্রীতি বলতে পারেন।

রাগিণীর কথায় কাঞ্চন হেসে বলল, আপনার বিচার-বুদ্ধির তারিফ করতে পারলাম না।

কেন?

সাংসারিক বুদ্ধি আপনার কম।

বলেন কী? জানেন, একটা পুরো সংসারের আমিই হচ্ছি সব কিছু।

তা সত্ত্বেও।

কারণ ?

কারণ হচ্ছে, এটা সহজবুদ্ধি যে মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু। মেয়েরাই মেয়েদের সহ্য করতে পারে না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন, তা কী আপনি জানেন ?

এটা সম্পূর্ণই মেয়েদের স্বভাব।

সে স্বভাবটি কেন গড়ে ওঠে বলুন তো কাঞ্চনবাবু ?—বাঁকা চোখে রাগিণী এইবার কাঞ্চনের দিকে তাকাল।

কাঞ্চনের মুখে আর ভাষা নেই।

শুনুন, আমিই তবে বলি। মেয়েরা মেয়েদের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে ওঠে শুধু পুরুষদের জন্যেই।

বলেন কী ?

হ্যাঁ। আশা করি আমার বক্তব্য এবার বেশ পরিষ্কার বুঝেছেন।

কাঞ্চন রাগিণীর দিকে চেয়ে বলল, আর বুঝে কাজ নেই।

কেন ?

এইবার তাকিয়ে দেখুন বাইরের দিকে। যা দেখতে এত কষ্ট করে এতখানি পথ এসেছেন,—দেখুন কী অপরূপ তার শোভা।

কাঞ্চন চুপ করে গেল।

রাগিণীও।

মেঘ আর পাহাড়। ঝরণা আর ঝিল্লির ডাক। মোটর ছুটে চলেছে স্পীডে।

পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথের রেখা, উঁচুতে আর নিচে—সমস্ত পথকে একটা ঘুর্ণী আর রোমাঞ্চের মাধুর্যে ভরিয়ে রেখেছে।

রাগিণীর মনে রবীন্দ্রসংগীতের একটি ছত্র গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে—

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

রাগিণীর হয়েছে ঠিক তাই। তা না হলে এখন এই মুহূর্তে জীবনের এতবড় রোমান্স আর রোমাঞ্চকেও সে প্রাণ ভরে উপভোগ করতে পারছে না কেন?

কী আশ্চর্য! হিমালয়কে বেষ্টন করে পাহাড়ীপথ। চড়াই আর উৎরাই। ঘুরে ঘুরে মোটর ছুটে চলেছে। থেকে থেকে গাড়ির গতি মন্থর। ঝির ঝির করে ঝর্ণা বইছে।

পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। চারদিকে শুধু শিলাময় জগত।

স্তব্ধ-বিস্ময়ে শৈল-পরিক্রমায় খানিকক্ষণ আত্মমগ্ন হয়ে ওঠে রাগিণী। কিন্তু আবার সেই ভাবনা। সিনিয়র গ্রেড কেরানি-জীবনের সংসার-ভাবনা,—অফিস আর বাড়ি। ব্যস্ত জনপদ, সংসারের যত কিছু চাহিদা মেটাতে ক্লান্তি, অবসাদ আর একঘেয়ে জীবন।

এই একঘেয়ে জীবনকে ভুলতে চায় রাগিণী। একটানা ক্লান্তি, অবসাদ আর বিরক্তির খানিকটা ছেদ টানতে চায় সে। ইঁট, কাঠ আর কংক্রিট—ভিড়, কোলাহল আর রুদ্ধশ্বাস! এই নিয়েই বেঁচে থাকা,—পঁচিশ বছরের কুমারী-জীবনকে তার দলে পিষে মারছে সবাই মিলে।

বাঁচতে চায় সে। তাই এবার বিদ্রোহ করছে। বিদ্রোহ বৈকি। কয়েকশো টাকা খরচ করে দার্জিলিঙ-ভ্রমণ। হিমালয়-দর্শন। ম্যালে ওভারকোট গায়ে ঘুরে বেড়ানো, ঘোড়ায় চেপে ফটো তোলা—টাইগার হিলে গিয়ে ঘটা করে সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখা। এ কী কম বিদ্রোহ? কম বিলাস? এই বিলাস উপভোগ করতে কম বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হয়নি রাগিণীকে। বাপের সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে—কত কথা-কাটাকাটি, কত ঝগড়া-বিবাদ, বাদ-বিসম্বাদ।

বাপ-মায়ের রাগ তাঁদের বঞ্চিত করে, ভাই-বোন সংসার পরিজনকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কয়েকশো টাকা হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া

নীতিহীনতা—চরম নীতিহীনতা বৈকি। গরিবের সংসারে অত আবার শখের বালাই কেন?

রাগিণীর পক্ষেও যুক্তি আছে।

তিলে তিলে জীবনকে ক্ষয় করে হাড়-ভাঙা খাটুনির বিনিময়ে উপার্জিত মাস-মাইনের টাকাগুলি সবই তো সংসারের গর্ভে যাচ্ছে। আত্মকেন্দ্রিক মন দিয়ে বিচার করলে দেখ যায় না কী এসবই ভস্মে ঘি ঢালা?

নিজের জন্যে কতটুকুই বা ব্যয় করে রাগিণী তার স্বোপার্জিত অর্থ থেকে। ভালো শাড়ি-গয়না কেনা, সিনেমা যাওয়া, রেস্টুরেন্টে খাওয়া, ট্যাকসি চাপা—না, কোন বিলাসই নেই রাগিণীর জীবনে। এমন কী পঁচিশ বছরের নারীজীবনের যৌবনের দাবিকেও উপেক্ষা করে চলছে সে।

বিয়ের কথা তো ভাবতেই পারে না। বাড়ির কেউই সেকথা ভাবে না। ভাবলে সংসাব চলবে কেমন করে। সে ভাবনা করতে হয় শুধু রাগিণীকেই।

সংসারের কল্যাণে ব্যক্তিগত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আশা, আনন্দ সব কিছুকেই বর্জন করতে হয়েছে তাকে।

তবুও রাগিণী মন পায় না মা-বাপের। ভাইদেরও। অথচ এদের জন্যেই রাগিণীর কতই না আত্মত্যাগ। সেকথা নির্মম সংসার একবার ভেবেও দেখে না।

একুশ বছর বয়েস পর্যন্ত রাগিণীর জীবন ভালো ভাবেই কেটেছে। মাসি অবিশ্যি খুব বড়লোক ছিলেন না, তবু নিত্য অভাবের জ্বালা ছিল না সংসারে।

স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ভালো ভাবেই পাশ করেছিল রাগিণী। আর সেজন্যে মেয়েদের নাম করা কলেজ দক্ষিণ কলকাতায় অবস্থিত লেডী ব্র্যাবোর্ণে আই-এ ক্লাশে ভর্তি হতে পেরেছিল। ইণ্টারমিডিয়েট আর্টসে ভালো রেজাল্ট হল না। বি-এ পড়তে

লাগল ভবানীপুরে আশুতোষ কলেজে দর্শনশাস্ত্র আর ইতিহাস নিয়ে। এক বছর ফেল করে পরের বছর পাশ কোর্সে বি-এ পাশ করল সে। তবু তাতেই মাসির কি আনন্দ! কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়েছে তাঁর বোনঝি। তাঁদের কালে যে ক্ষেত্রে মেয়েরা কলেজের মুখ দেখলেই আনন্দ এবং জজ, ম্যাজিস্ট্রেট না হোক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, উকীল কিংবা ভালো চাকরি করা পাত্র পাওয়া কষ্টকর ছিল না, সেক্ষেত্রে বোনঝি তাঁর গ্রাজুয়েট হয়েছে, আর তিনিও নিঃস্ব নন। সুতরাং রাগিণী এখন অন্য কিছুতে না হোক ইস্‌লামিক হিষ্ট্রি নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়বে।

মাসি গ্র্যাজুয়েট বোনঝির জন্যে এখানে সেখানে ভালো পাত্রেরও খোঁজ করতে লাগলেন। কিন্তু পোড়া কপাল রাগিণীর। সব ওলট-পালট হয়ে গেল।

তিন বছরের চাকরি জীবন এখন। রাগিণী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। জীবনকে তার দলে পিষে মারা হচ্ছে।

পার্ক সার্কাসের দোতলা বাড়ির একতলার একাংশে ছোট দু'খানি ঘর যেন দুটি চোরা কুঠরি। তা না হলে মাসিক মাত্র পঞ্চাশ টাকায় দক্ষিণ কলকাতার এমন অঞ্চলে এত শস্তায় ভাড়া পাওয়া যায়! ঘর দু'খানিতে হাওয়া নেই আলো নেই। দম বন্ধ হয়ে আসে। তবু ভালো যে পাশাপাশি অন্য দু'ঘর ভাড়াটে আর বাড়িঅলা ভদ্র ব্যবহারই করেন।

এরই ভেতর জীবন চলেছে। কিন্তু যৌবন শুকিয়ে আসে।

ছোট একখানি ঘরে মা, বাবা, ছোট একটি ভাই। আর একখানি ঘরে বড় ভাই থাকে। রাগিণীর দৌলতেই এক মারোয়াড়ি কারখানায় চাকরি, কিন্তু চাকরে ভাইয়ের দাপট কত! আলাদা ঘর চাই, বিলাস চাই, বৈভব চাই; পাঁচটা ইয়ার বন্ধু আসবে—চা খাবে, ধূমপান করবে। ছুটির দিনে তাস পিটবে, ক্যাশ খেলবে—স্বতন্ত্র ঘর না হলে চলবে কেন?

আর সরকারি দপ্তরের আপার ডিভিশনের কেরানি রাগিণী—বে নাকি সমস্ত সংসারটি বুকে করে ধরে রেখেছে তার ভাগ্যে জুটেছে বারান্দায় কাঠ দিয়ে ঘিরে-নেওয়া একফালি জায়গায় ছয় বাই আট ফিটের একখানি কক্ষ। দম বন্ধ হয়ে আসে বন্ধ হাওয়ায়। ভাদ্রের গুমোটে ঘুম হয় না বলে ছোট একটি টেবিল ফ্যান, তাও সব সময় চললে আগুন ধরে যাবে; তাই মাঝে মাঝে চলন্ত পাখাকে বিরতি দিতে হয়। তা নিয়েই কী কম কথা কম সমালোচনা? ইলেক্‌ট্রিক পাখার হাওয়া ছাড়া বিবির আমার ঘুম হয় না!—এমনি সব মন্তব্য!

তবু এরই মধ্যে দিন চলছিল। মা, বাবা, দুই ভাই, রাগিণী নিজে আর তার ছোটবোন—এই ছ'জন নিয়ে সংসার। বাড়তি এক-জন ঠিকে ঝিও রাখতে হয়েছে রান্নাকরা ছাড়া বাকী দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করানোর জন্যে। একবেলা খাওয়া-পরা থাকা, নগদ দশটাকা মাস মাইনে।

হঠাৎ শোনা গেল মায়ের শরীর খারাপ। গা ঘুলোচ্ছে, বমি হয় মাঝে মাঝে। তারপর যা,—তা শুনে শিউরে ওঠে রাগিণী। শিউরে উঠলে কী হয়? এই নাকি জীবন! তাদের মতন মধ্যবিত্ত পরিবারের এই হচ্ছে জীবন-সংজ্ঞা।

কারখানায় কাজ করা উপার্জনশীল ভাইয়ের জীবন-সঙ্গিনীর দরকার। রাগিণী রাগ করলে কি হয় বাবা-মা তো অবিবেচক হতে পারেন না। একখানা স্বতন্ত্র ঘর তো রোজগারে ছেলের জন্যে রয়েছেই, অতএব উপযুক্ত পাত্রী-অন্বেষণের কাজ চলেছে।

কিছুই কী দরকার নেই রাগিণীর জন্যে?

বিদ্রোহ জাগে তার মনে।

কেন তবে এই আত্ম-প্রবঞ্চনা? তার কুমারী-জীবনে কী কোন বিলাসই থাকতে নেই? একটু দম ফেলে নিঃশ্বাস নেওয়া, হাল্‌কা হাওয়ায় একটু গা-মেলে দেওয়া, প্রিয়জনের

সঙ্গে অফিসের ছুটির পর ইডেনগার্ডেন্স কিংবা আউটরাম ঘাটের গঙ্গার ধারে একটু রোমান্সের জীবন কিংবা সন্ধ্যের শোতে সিনেমা যাওয়া—এও কী খুব স্বার্থপরতা? নীতিহীনতা? হোক্ স্বার্থপরতা আর নীতিহীনতা, তবুও রাগিণী বাঁচতে চায়। বাঁচতে চায় বলেই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্কা মায়ের আবার সন্তান সম্ভাবনার কথা শুনে রাগিণীও ঠিক করে ফেললে আর নয়। এবার তাকে স্বার্থপর হতে হবে। নিজের যুবতী-হৃদয়ের কামনাকে মেটাতে হবে, আর সেদিক থেকে দাদার বন্ধু শিশিরই না হয়ে হোক তার জীবনসঙ্গী।

শিশিরের কথা মা-ই বলেছেন। হাজার হোক,—মেয়েদের মন তো! মাতৃ-হৃদয় আছে বৈকি!

দাদারও এবিষয়ে কিছু আগ্রহ আছে। তবে এক্ষুনি কেন! শিশিরের বাপের পয়সা আছে, কলকাতায় নিজস্ব সম্পত্তি। বাপ-মায়ের এক ছেলে। বাড়িভাড়ার আয়েই সংসার চালাতে পারে। আর তা ছাড়া মামার সুপারিশে ভালো ব্যাঙ্কেই ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে টাকা দেওয়া-নেওয়ার যা হোক একটা চাকরিও করে।

মাসি যেখানে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র কিংবা উচ্চপদস্থ অফিসার পাত্র খুঁজছিলেন বোনঝির বিয়ের জন্যে সেখানে অশিক্ষিত অতি সাধারণ পাত্র এই শিশিরকুমার। হোক না কেন বাপের এক ছেলে, থাকুক না কেন মধ্য কলকাতায় নিজস্ব দোতলা বড় বাড়ি একখানা।

তা বলে শিশির কী কখনো রাগিণী চ্যাটার্জীর পক্ষে উপযুক্ত পাত্র হতে পারে?

কিন্তু তিতি বিরক্ত হয়ে উঠেছে রাগিণী। বিশেষ করে এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মায়ের আবার সন্তান সম্ভাবনার খবরে ক্ষেপে উঠল সে।

চার ছেলেমেয়ের মা,—আরো তিনজন গর্ভেই নষ্ট হয়ে গেছে। সে কথা ভাবলেও গা ঘিন ঘিন করে ওঠে রাগিণীর।

নাছোড়বান্দা শিশির।—আর কতদিন এমন ঝুলিয়ে রাখবে?

তোমার বাড়ির সকলেরই পছন্দ আমাকে। আর তুমিও আশা করি........

শিশিরের কথায় রাগিণী চমকে উঠল, বাড়ির সকলেরই পছন্দ তাকে? হ্যাঁ, তা পছন্দ বৈ কি! তা না হলে শুধু এটা ওটা উপহার উপঢৌকনই বাবা-মা নির্বিবাদে শিশিরের কাছ হাত পেতে নেন না, তার চেয়েও বেশি দাবি তাঁদের। সংসারের যে কোন অভাব-অভিযোগ এবং প্রয়োজনকে প্রকাশ করেন আর শিশির তা খুশি মনে মেটায়। কিসের জোরে? রাগিণী অবশ্যই তা বোঝে।

শিশিরের সরাসরি বিবাহের প্রস্তাবে হঠাৎ রাগিণী রাজি হয়ে গেল। তবে এক্ষুনি নয়। আরো মাস কয়েক অপেক্ষা করতে হবে তাকে। তার আগে রাগিণী একবার বাইরে ঘুরে আসবে। তারপর। শিশির সঙ্গে যেতে চায়।

না, রাগিণী কিছুতেই রাজি নয় তাতে।

দার্জিলিঙ যাওয়ার কথা শুনে বাবা রুখে উঠলেন, পয়সাগুলো কী এতই শস্তা? অফিসের ছুটি নিয়ে দার্জিলিঙ বেড়ানো।

আমার নিজের রক্তজল করা রোজগারে বেড়াচ্ছি, এতে কারুর কিছু বলবার নেই। বললেও তা মানব না—এতটা কঠিন কথা অবিশ্যি রাগিণী বলতে পারেনি বাপের মুখের ওপর।

তবু বলেছে, এটুকু দরকার। আমার নিজের জীবনের জন্যে শরীরের জন্যেই একান্ত দরকার। মানুষ তো আর মেশিন নয়। মেশিনকেও মাঝে মাঝে বিশ্রাম দিতে হয়, তা না হলে কলকব্জা ঠিক থাকে না।

কেন শরীরের আবার কী হল?

কী হল সে-খবর রাখে কে?

মেয়ের কথায় বাবা বললেন, শরীর খারাপ তো ডাক্তার দেখাও। কলকাতায় কী ডাক্তারের অভাব?

মা ফোড়ন কাটলেন। স্বামীকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমি চুপ কর।

রোজগারে মেয়ে। ও এখন স্বাধীন। তোমার-আমার তোয়াক্কা করবে কেন? তুমি আমি বাধা দেবার কে? আমরা তো এখন ওরই অধীন—ভাত-কাপড়ের দাস-দাসী।

হ্যাঁ। ঠিক তাই। মুখে বলেনি রাগিণী। মনে বলেছে। আর তাই সুটকেস গুছিয়ে বিছানাপত্তর বেঁধে পার্ক সার্কাস থেকে সোজা চলে এসেছে শিয়ালদহে। সেখান থেকে আসাম লিঙ্ক এক্সপ্রেস।

আসার সময় শুধু ছোটবোন কামিনীর আব্দার শুনে এসেছে, দিদি ভাই, আমার জন্যে আর কিছু নয় দার্জিলিঙ থেকে একটা পাথরের নেকলেস এনো।

কী পাথর চাস?

দিদির কথায় কামিনী খুশি মনে জানিয়েছে, ক্যাটস্ আই।

কাঞ্চনের ডাকে রাগিণীর তন্ময়তা ভেঙে যায়।

সত্যি করে বলুন তো কী ভাবছেন আপনি?

রাগিণী বলল, কই কিছুই নয় তো।

প্রথম বারের কথায় বিশ্বাস করেছিলাম, রাত্তির জেগে আর ট্রেন-জার্ণিতে ক্লান্ত হয়ে হয়ত বুঝি তন্দ্রার ভাব এসেছে; কিন্তু শেষে দেখলাম চোখ দুটো আপনার খোলাই রয়েছে।

মৃদু হেসে রাগিণী জিগ্যেস করল, আর কী দেখলেন?

কাঞ্চন উত্তর দিল, বাইরের চোখ দুটি খোলা; কিন্তু মনশ্চক্ষুর সন্ধান কিছু পেলাম না।

তা মনশ্চক্ষুর অনুসন্ধানে এত ব্যস্তই বা কেন?

বড্ড শক্ত প্রশ্ন করে ফেললেন দেখছি।

রাগিণী এ-প্রসঙ্গকে চাপা দেবারে চেষ্টা করে,—সত্যিই একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিল।

কাঞ্চন জিগ্যেস করে, জেগে ঘুম?

মানুষ চোখ খুলেও ঘুমোয়—আপনি কী তা বিশ্বাস করেন না?

করি।

তবে?

এক্ষেত্রে নয়।

কারণ?

কারণ হচ্ছে গাড়ির এই বদ্ধ পরিবেশের বাইরে চোখ যে আপনা হতেই এখন বাইরে চ'লে যায়। একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখুন তো!

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে রাগিণী, সত্যিই কী অপূর্ব দৃশ্য। লাভলি!

কাঞ্চন এইবার বলল, পাহাড়ের এমন অরণ্যপ্রকৃতি ছেড়ে যে বিষয়ে আত্মনিমগ্ন হয়েছিলেন তা নিশ্চয়ই কোন গভীরতর ব্যাপার। অবিশ্যি তা নিয়ে আমার মাথা ঘামানো অন্যায় এবং অনধিকার চর্চা। আপনাকে শুধু সচেতন করবার চেষ্টা করছি—প্রথম হিমালয় দর্শনের অনুভূতিকে গ্রহণ করুন। এমন অপূর্ব বিস্ময়—যার দৃশ্য আর আকর্ষণে এতখানি পথ কষ্ট করে ও খরচ করে ছুটে এলেন, তা থেকে বঞ্চিত হওয়া ঠিক হবে না।

রাগিণী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি আমার সত্যিকারের বন্ধু।

কাঞ্চন স্মিত মুখে উত্তর দিল, বন্ধু নই। বন্ধুর দাদা। অতএব আপনারও—

না। দাদা নন। বন্ধুই। বন্ধুর সঙ্গে অসঙ্কোচে মেশা যায়।

দাদার সঙ্গে বুঝি নয়?

না। সব জায়গায় নয়।

তাহলে দাদা হলাম না?

না। অন্তত এই হিমালয়ের অরণ্যময় এমন চমৎকার পথ পরিবেশে নয়।

কাঞ্চন খুশি মনে বলল, বাঁচলাম। বহু ধন্যবাদ আপনাকে। দাদা হওয়ার জ্বালা অনেক। আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব লাভের সৌভাগ্যকে প্রশান্ত মনে বরণ করে নিলাম।

রাগিণী উত্তর দিল, আমিও খুশি হলাম।

তাহলে এবার সত্যিকার মনের কথাটি খুলে বলুন তো, কী ভাবছিলেন এতক্ষণ?

বিশেষ কিছুই নয়।

তবু?

তার জন্যে আপনারই বা এত আগ্রহ কেন?

বন্ধু বলে। যদি কিছু ভাবনার ভার লাঘব করতে পারি।

কাঞ্চনের আগ্রহান্বিত প্রশ্নের উত্তরে রাগিণী শুধুমাত্র বলল, ভাবছিলাম সংসারের কথা।

রাগিণীর কথা শুনে পরিহাসের সুরে কাঞ্চন বলল, লোকে হিমালয়ে আসে বৈরাগীর মন নিয়ে।

রাগিণী জবাব দিল, তাঁরা হচ্ছেন সংসার-বৈরাগীর দল। সাধু সন্ন্যাসী। ভক্ত সাধক। আমি রক্ত মাংসের মানুষ। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।'

আরো একটু রসিকতা প্রকাশের লোভ সংবরণ করতে পারল না কাঞ্চন। বলল, সংসারের ভাবনা তো রোজই ভাবেন। সংসার মানে সঙের সার। কাঞ্চনগিরি হিমালয়ে এসে আবার সে ভাবনার জের টানছেন কেন? তবে আর কী সাধনা করলেন। তার চেয়ে বরঞ্চ রজতকাঞ্চন বর্ণের সমাবেশ দেখুন আকাশে আর পাহাড়ে। পাহাড়ে এসে পাহাড়ের কথা ভাবুন। হিমালয় কত উঁচু দেখুন। উপলব্ধি করুন এর উচ্চতাকে।

কাঞ্চনের কথায় কোথায় যেন একটু বিদ্রূপের স্পর্শ।

উষ্ণ সুরেই রাগিণী জবাব দিল, হ্যাঁ। আপনার দর্শন প্রকৃতই

উচ্চ স্তরের। আমি আবার মাটির মানুষ কিনা, তাই মাটির কথাই ভাবি। আপনার ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনার তফাৎ তো থাকবেই।

রাগিণীর কণ্ঠস্বরে আর কথার বিন্যাসে কাঞ্চন একটু অবাক হয়ে গেল। সহজ সরল ভাবে সে একটু রসিকতা প্রকাশ করতে চেয়েছিল রাগিণী তা বুঝল না কেন? তার কথার অন্য অর্থই বা খুঁজতে গেল কী জন্যে? সত্যিই সে তো আর বাগিণীকে ব্যঙ্গ কিংবা উপহাস করে কিছু বলতে চায়নি।

অত্যন্ত বিনীতভাবে কাঞ্চন বলল, আপনি অন্য অর্থ ধরছেন আমার কথার।

আপনার কথার নতুন কী আর অর্থ থাকতে পারে কাঞ্চনবাবু? হিমালয়ের অধিবাসী আপনাবা। হিমালয় আপনাদের কাছে অনেক উঁচু কল্পনার জগৎ। এখানে আপনারা শুধু ভাব-জগৎকে উপলব্ধি করেন। অথচ এখানেই আপনাদেরই পাশাপাশি যারা আছে,—এই যে পাহাড়ীরা! কত দরিদ্র, কত প্রবঞ্চিত! এদের দিকে কী তাকিয়ে দেখেন? অনেক অর্থ, বিত্তও অনেক। আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা, আমরা তো আর উঁচু আকাশের মানুষ নই, তাই হিমালয়ের উচ্চ-দর্শনকে অনুভব করতে পারিনে। আমরা হচ্ছি পাহাড়ের নিচে ওই অধিত্যকা। দেখতে পাচ্ছেন না? পাহাড়ের তলায় ওই যে গভীর অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ? আমরা হচ্ছি ওখানকার মানুষ। যতই ওপরে উঠি না কেন, নিচের ওই অন্ধকারের দিকেই চোখ ফিরে ফিরে চায়। নিজের অস্তিত্বকে আপন পরিবেশকে কী করে ভুলি বলুন? কিছুই নয় কাঞ্চনবাবু—এ হচ্ছে শুধু অবস্থা ভেদে দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ মাত্র!

রাগিণীর কথায় কাঞ্চন ব্যথিত হল।

অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, মাপ করবেন রাগিণী দেবী! সত্যিই আপনাকে উপহাস কিংবা অপমান করবার জন্যে আমি কিছুই বলিনি, আমার কথা নিতান্তই হাল্কা। নিছক পরিহাস মাত্র। শুধু কথার

পিঠে কথা। আশা করি, এরপর আর আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

রাগিণী তার রূঢ়তায় লজ্জিত হয়ে উঠল। যে বন্ধু এত উদার— সামান্যমাত্র কিছুক্ষণের আলাপে এত সৌজন্য প্রকাশ করেছে তার প্রতি এ-বিমুখতা সত্যিই মনে অনুশোচনা জাগায় এখন।

রাগিণীও অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, হঠাৎ বড় রুক্ষ হয়ে পড়েছিলাম কাঞ্চনবাবু। আশা করি ক্ষমা করবেন।

কাঞ্চনের কাছে নিজেকে আরো মেলে দিয়ে আরো কাছে সবে বসে রাগিণী বললে, সত্যিকারের বন্ধু বলেই জেনেছি আপনাকে। সংসারের অনেক দুঃখ কষ্টে জর্জরিত, তাই দু'চার দিনের আনন্দ সঞ্চয়ে বেরিয়েছি। হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল। এ-পরিবেশ থেকে সরে গেলাম সংসারের প্রতিদিনের কদর্যতায়, তাই হঠাৎ আপনাব কথাকে ঘুরিয়ে ধরেছিলাম। আশা করি কিছু মনে করবেন না।

সহানুভূতিতে গলে পড়ল কাঞ্চন। কঠিন বরফ যেমন গলে পড়ে। পাহাড়ের কঠিন বুক থেকেও পথের এ-ধারে নির্ঝরিণীর ধারা বয়ে চলেছে ঝির ঝিব করে।

বাগিণীর চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে।

পাহাড়ের অরণ্যময় প্রকৃতি।

মোটর ঘুরে ঘুবে উঁচুতে উঠছে। একটু একটু করে অনেক উঁচুতে উঠেছে এতক্ষণে। নিচে গভীর খদ দেখলে ভয় করে। রাগিণী আর নিচের দিকে তাকায় না। শুধু বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখে পাহাড়ের অরণ্যপথের দৃশ্যাবলী।

হেমন্তের প্রসন্ন সকাল।

সোনার রোদে চারদিক ভরে উঠেছে। সকাল পার হয়ে গিয়ে দুপুরের রোদ্দুর পাহাড়ের গায়ে ঝক্‌ঝক্ করছে! আর নিচে পাহাড়ী নদী তিস্তা রূপালি রেখায় প্রবাহিত। ঝি ঝি করে ঝিঁঝি ডাকছে।

পূর্ব সুর ! সেতারের ঝালায় কখনো মীড়ের টান কখনো বা অনেক কম সুরের ঝংকৃত সুরধ্বনি।

করোনেশন ব্রীজ পার হয়ে গেল।

চলন্ত মোটর থামিয়ে কাঞ্চন রাগিণীকে দেখালে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিস্ময়কর যন্ত্র-কৌশল।

রাগিণী তা দেখল বটে, কিন্তু আরো বেশি করে দেখল—তিস্তার র প্রবাহিনী স্রোতধারা। তরতর করে পাহাড়ী কন্যা বয়ে চলেছে—ছোট ছোট ঢেউ-এর তুফান তুলে ঘুর্ণীর আবর্ত আর সাদা সাদা ফেনা। নদীর কলতান কিছুক্ষণ ধরে বিমুগ্ধচিত্তে শুনতে লাগল রাগিণী।

কাঞ্চন বলল, আপনার সত্যিকারের শিল্পী-মন রাগিণী দেবী।

কেন ?

করোনেশন ব্রীজ ছেড়ে তা না হলে কেউ তিস্তার স্রোতে ভেসে চালে ?

রাগিণী হাসল—এযুগে এটা কিন্তু অপবাদ।

কেন ?

এমন উন্নত বৈজ্ঞানিক যুগে এখনো কেউ যদি অরণ্য-প্রকৃতি নিয়ে মেতে থাকে, তাহলে তার মানসিকতাকে কিছুতেই প্রশংসা করা যায় না।

কাঞ্চন প্রশ্ন করল, বিজ্ঞানকে আপনি ভালোবাসেন না ?

রাগিণী উত্তর দিল, নিশ্চয়ই বাসি। তবু কেমন যেন দুর্বলতা। প্রকৃতি আজো আমাকে টেনে নিয়ে যায় বিজ্ঞানের জড়রাজ্য থেকে।

ওটা একটা সংস্কার। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য !'

হয়ত তাই।

আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো দেখি এমন আলোজ্বালা নগর ছেড়ে আমরা কী আর এযুগে আদিম আরণ্যক হতে পারি ?

হলে তবে বুঝতাম। না হয়ে কী করে মন্তব্য করি বলুন ?

...এই বোকা উত্তরে কাঞ্চন খুশি হল না। সে নিজে এক ইঞ্জিনিয়র। পাথর কেটে নগর গড়া তার কাজ। অরণ্য থেকে ইঁট কাঠ লোহা আর সিমেণ্টের কংক্রীটের প্রতি অনুরাগ তার বেশি। কালিম্পং-এর পাহাড় কেটে নগর গড়ার কাজে সে আত্মনিয়োগ করেছে এবং গভর্ণমেন্ট কনট্রাক্ট পাচ্ছে। বেশ দু'পয়সা রোজগার তার এ-ব্যবসায়ে। আর নিজের শিক্ষা-দীক্ষা এবং বংশগত ধারায় বৈজ্ঞানিক মন তার গড়ে উঠেছে। তাই রাগিণীকে সে করোনেশন ব্রীজ-এর কনসট্রাক্সনের কৌশল রীতি বুঝিয়ে বলছিল—কেমন করে নদীর ওপর ব্রীজটা ঝুলে রয়েছে, আর নিরপত্তাও কত।

রাগিণীর আগ্রহ কম। এই পাহাড় নদী আর মেঘ—এই তাকে আকর্ষণ করছে বেশি। খানিকক্ষণ এখানে থেকে তাই সে তাগিদ দিল, চলুন এবার গাড়িতে ওঠা যাক।

করোনেশন ব্রীজ পার হয়ে মোটরের গতিপথে আরো কত দৃশ্য।

পাহাড় আর পাহাড় কুয়াসা আর মেঘ, অরণ্য আর ধূসরতা। ঝর্ণা আর পাখির ডাক, ঝিঁঝিঁ আর বন-তিতিরের শব্দ, ফুল বন আর রঙ শুধু রঙ। কত রঙের বাহার আকাশে পাহাড়ে পথের ধূলোয়।

এরই মাঝে তিস্তা ব্রীজ পার হয়ে গেল মোটর। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে ধস নেমেছে। পাহাড়ের খণ্ড অংশ ধসে ধসে পড়েছে। পাহাড়ী ছেলে-মেয়ে, যুবা-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—কী কর্মঠ তারা। ভারী ভারী বোঝা পিঠে করে অনায়াসে বয়ে নিয়ে চলেছে। তাদের মুখে-চোখে দীপ্তি, মনে খুশির প্লাবন—রাগিণী বিস্ময়ের সঙ্গে ছাখে।

দুর্বোধ্য ভাষায় কাঞ্চন কয়েকজন পাহাড়ীর সঙ্গে কী যেন বলল।

রাগিণী জিগ্যেস করল—কতদিন আছেন এখানে ?

এই বছর পাঁচেক।

এই মধ্যে পাহাড়ী ভাষা এত রপ্ত করে ফেলেছেন ?

শুধু ভাষা কেন ? আচার ব্যবহারও। আমি যখন পাহাড়ী

সাজে মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে কাজে বের হই তখন আমাকে দেখলে পাহাড়ী বলেই ভুল করবেন।

দেখাবেন তো আপনার সে বেশ।

দেখাব! আর আপনাকেও একদিন পাহাড়ী-রমণী সাজে সাজিয়ে ফটো তুলব।

আমার!

হ্যাঁ।

আমার শহুরে চেহারাকে ঢেকে দিতে পারবেন?

নিশ্চয়ই। দেখবেন,—আপনিও নিজেকে দেখে বিস্মিত হবেন।

লোকে বলে নাকটা আমার উঁচু, সেটাকে চ্যাপ্টা করবেন কেমন করে? —রাগিণী খিল খিল করে হেসে উঠল।

একান্ত পার্শ্ববর্তিনী তরুণীর নাকে হাত দেওয়ার মতন অসৌজন্য ব্যবহার অবিশ্যি কাঞ্চন প্রকাশ করে নি,—তবুও এক দৃষ্টে রাগিণীর চোখ মুখ নাক ঠোঁটের দিকে বেহায়ার মতন তাকিয়ে কাঞ্চন মন্তব্য প্রকাশ করল,—নাক উঁচু নয়, নাক টিকলো,—সত্যি ভারি সুন্দর নাকের গড়ন আপনার।

রাগিণী কী রেগে গেল না খুশি হল?

কোন ভাবকেই মুখে-চোখে প্রকাশ না করে সে আবার তন্ময় হয়ে রইল পাহাড়ী দৃশ্যে। যে রাস্তাটা এপাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে আঁকা-বাঁকা, সেই রাস্তায় পৌঁছে আবার দেখা যায় পিছনে ফেলে আসা পথের দৃশ্য। পাহাড়ের গা বেয়ে পাইনের বনাচ্ছাদিত পথ। বাঁকের মুখে আসতে সোফার রামবাহাদুর হর্ণ দেয়, কিন্তু সামনে—একেবারে অতি কাছে মুখোমুখি এসে পড়ে আর একখানি বিপরীতগামী গাড়ি। কখনো লরি আবার কখনো বা পিক্ আপ।

এই, এই রোখ্‌কে! ভয়ে চিৎকার করে ওঠে রাগিণী।

ভয় নেই মেমসাব! একদম ব্রেক কষে ছুটন্ত মোটর থামিয়ে ড্রাইভার রামবাহাদুর পরিষ্কার বাংলায় বলে—ভয় পাচ্ছেন কেন?

সামনের গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে রায়বাহাদুরের নমস্কার প্রতি নমস্কারের আদানপ্রদান চলে।

কাঞ্চন হেসে ওঠে আর রাগিণী সত্যিই ভয়ে অনেক কাছে সরে বসে বলে—ভয় করে না?

মোটেই নয়। এইতো মজা।

ছাই মজা।

কী রোমান্স বলুন তো?

রাগিণী বলে—হ্যাঁ, এ্যাডভেঞ্চার বটে; কিন্তু ভয় করে যে!

মোটর চলেছে।

মাঝে মাঝে গাড়ীতে স্পীড দেয় রায়বাহাদুর। বাঁকের মাঝে শুধু মন্থর গতি। ঘোরাপথে মাথা ঘুরে যায়। ভয় আর শিহরণের মাঝে সত্যিই এক অপূর্ব রোমাঞ্চ। স্নায়ুতন্ত্রীতে উত্তেজনা,ধমনীতে উষ্ণ রক্তের প্রবাহ—জীবনেব এক নতুন আস্বাদ। সম্পূর্ণ নতুনতর।

নগরীর পীচ ঢালা রাস্তায় দশ-পাঁচটার কেরানি নয় আর সে এখন। জীবন-প্রবাহে নেই আর সেই শ্লথতম গতির শিথিল ধারা। অবসাদে ভরা শরীর, ক্লান্ত পদযুগল—মানুষ আর যানবাহন, রোদ আর বৃষ্টি, ঘাম আর কাদা কিছুই নেই এখানে। বাসে-ট্রামের অসভ্যতা, গলদঘর্ম হয়ে সামনের ভিড় ঠেলে ট্রাম-বাসে ওঠার চরম দুর্ভোগ গদিআঁটা চলন্ত মোটরে এখন আর অনুভব করতে রাজি নয় রাগিণী। পাশের তরুণ জোয়ান সুশিক্ষিত সুমার্জিত সঙ্গীর মধ্যেও কোন্ অশালীন ব্যবহার নেই। নেই পীড়ন,—নেই বেহায়াপনার উলঙ্গ স্পর্শ। সংযত, ভদ্র, মার্জিত পুরুষ আপন স্বকীয়তায় রাগিণীর মন টানে।

পার্ক সার্কাসের সেই অন্ধকার একতলার ছোট খুপরী ঘর,—নিশ্বাস যেখানে রুদ্ধ হয়ে আসে, সেখান থেকে মুক্তি পেয়েছে সে আজ, মহা মুক্তি। প্রকৃতির এই বনানী-শোভায়, পাহাড়ের গায়ে এ কেমন এক গন্ধ! প্রাণভরে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় রাগিণী।

দামী মোটরের নরম গদিতে বসা সুপুষ্ট স্বাস্থ্যবান তরুণ ধনী ইঞ্জিনিয়রের পার্শ্ববর্তিনী তরুণী রোগা লম্বাটে চেহারা। পঁচিশ বছরের নারী-জীবনের যৌবনকে কোনরকমে ধরে রাখায় প্রয়াসকে এখন আর তার মনে পড়ছে না। শহরের জীবন-যাত্রায় যা বার বার ধূসরতায় রুক্ষতায় ধরা পড়ে যায়—সে কথা নাই বা ভাবল এখন রাগিণী।

অতি সাধারণ বেশভূষা,—নিজে হাতে কেচে পরিষ্কার করে ইস্ত্রি করে নেওয়া।

কম দামের টয়লেটিং। শস্তা এসেন্সের গন্ধ, কিন্তু তাই—তাই যেন মনকে মাতিয়ে রাখছে এখন। যে যুবতী-নারীত্বের আবেদনে সাড়া দিতে আসে অফিসের প্রৌঢ় রেকর্ড-কীপার কিংবা হ্যাংলা ছোকরা কেরানি কিংবা পাড়ার বখাটে বেকার বা চলন্ত ট্রাম-বাসের ক্লিষ্ট সহযাত্রী—সে যুবতী-হৃদয় নারীত্বের এখন মহিমা কত! চলন্ত মোটরে পাহাড়ের পথে সে নারীত্ব গৌরবান্বিত।

নিচের খদ থেকে ক্রমে ক্রমে অনেক উঁচুতে উঠতে থাকে রাগিণী। সে যেন্ হিমালয়-অভিযানে বের হয়েছে। যাত্রা তার সার্থক। তা না হলে কাঞ্চনের হাতখানি তার করতল স্পর্শ করে থাকবে কেন?

কাঠের ঘর-বাড়িতে ইতস্তত ছড়ানো পাহাড়ী গ্রাম মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল। অনেক দূরবর্তী পথের মাঝে মাঝে বন্য পাহাড়ী প্রকৃতির পরিবেশে মানুষজনের দেখা মেলে। একটানা উঁচু-নিচু পথে থেকে থেকে ছেদ যেন।

এমনি করে আরো পথ পেরিয়ে কাঠের ঘর-বাড়ির মাঝে ইঁট-কাঠ আর সিমেন্ট কংক্রীটের সন্ধানও কিছু কিছু জায়গায় পাওয়া যায়।

ঠাণ্ডার একটা শিরশিরে আমেজ লাগছে গায়ে। এইবারে লেডীস্ ওভারকোটটা পুরোপুরি গায়ে পরে না নিলেও দু'কাঁধে মেলে নিতে যেন আরামই লাগে।

আপনার শীত করছে না?—জিগ্যেস করল রাগিণী কাঞ্চনের গায়ে একনা নীল টেরিলিনের সার্ট দেখে।

হেসে কাঞ্চন জবাব দিল, না।

আমার কিন্তু করছে।

ওভারকোটটা গায়ে ঢেকে নিন।

আপনি শুধু সার্ট গায়ে আর ট্রাউজার পরে আছেন কি করে?

শীত কোথায়? শীত তো নেই। শীত খানিকটা পড়ে ডিসেম্বর, জানুয়ারিতে। তাও এমন কিছু নয়। দার্জিলিঙে বরঞ্চ ঠাণ্ডা বেশি। কালিম্পং অঞ্চলে এখনো আমাদের শ্লো-পয়েন্টে পাখা চালাতে হয়।

বলেন কি? তাহলে বসব পয়সার গরমের জোরেই শীত আপনার কম। /

আপনার ধারণা পয়সা কী আমার খুব বেশি?

নেই?

না, আছে। কেননা, নিজেকে বড়লোক ভাবতে খুশিই হই। সে যাক্! শীত আমার কম, আর তার কারণ হচ্ছে আমার দেহে মেদ আছে। আপনি বড্ড রোগা কিনা! তাই শীত বেশি।

শরীরতত্ত্ব আর অর্থতত্ত্ব যাক্। কোথায় এলাম বলুন তো?

প্লেন থেকে অনেক উঁচুতে। এই চার হাজার ফিট্,—হ্যাঁ, তা হবে।

আর কদ্দূর যেতে হবে?

এই তো এসে গেছেন। আমরা কালিম্পং-এর কাছাকাছি।

এসে গেছি!—আনন্দে করতালি দিয়ে ওঠে রাগিণী।

নিচের দিকে এবার তাকিয়ে দেখুন,—তিস্তাকে কেমন দেখাচ্ছে।

চমৎকার। সত্যি ভারি সুন্দর। নিচের দিকে তাকিয়ে ছাখে রাগিণী, বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখ ছুটি মেলে—একটা রূপালি স্রোতধারা সিরসির করে বয়ে চলেছে।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ রাগিণীর,—আর কী সুন্দর রঙের বাহার দেখুন কাঞ্চনবাবু! সামনে সাদা পেঁজা একরাশ তুলোর মতন। ওটা কী?

ওটা ফগ।

পিছনে দেখুন, কী রঙের বাহার! নীল—সুনীল। না, নীলকান্তি। নীলান্ত।

ওটা মেঘ।

আর পাহাড়ের মাথায় চন্দ্রাকৃতি ওই যে ঝকমকে ঔজ্জ্বল্য?

ওটা রোদ্দুর!

কিন্তু কাঞ্চন কই?

কাঞ্চন হেসে উত্তর দেয়,—এই তো আপনার পাশেই।

অপ্রতিভ হয়ে ওঠে রাগিণী,—এ কাঞ্চন নয়।

আমি কী তা হলে নকল?

আমি কী তাই বলেছি? নাঃ, আপনার সঙ্গে কথায় পারবার উপায় নেই। আমি জিগ্যেস করছি, কাঞ্চনজঙ্ঘার কথা

হেসে কাঞ্চন বলে,—কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আজ আর দেখতে পাবেন না। সব সময়ে তাঁর দেখা মেলে না। কাল সকালে তাঁর উদয় দেখবেন আনার কাঁচের ঘর থেকে।

আর সূর্যোদয়?

সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখবেন দার্জিলিং-এ গিয়ে। টাইগার হিল থেকে।

কালিম্পং থেকে সূর্যোদয় দেখা যায় না?

রাগিণীর প্রশ্নে কাঞ্চন মৃদু হেসে উত্তর দিল,—যায়। তবে ঘটা করে নয়।

কাঞ্চনের এ কথায় রাগিণীর চোখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল,—ঘটা করে সূর্যোদয় দেখা আবার কী?

কেন? যা দেখতে সবাই আসেন। আর যাঁরা কবি তাঁরা তা নিয়ে অনেক কবিতা লেখেন—চাই কি আপনিও লিখতে পারেন। ভক্তজন খুশি হবেন তাতে। আর যদি লাগসই কিছু ফটো তুলতে

পারেন তা হলে সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী নিয়ে মাসিক পত্রিকা থেকে দু'পয়সা রোজগারও করতে পারেন।

বাঁকা চেখে কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে রাগিণী বলল,—বলেন কী! আপনার আবার ও-বাতিকও আছে নাকি?

আরে রামো, ছোঃ। ওকাজ ভদ্রলোকে করে?

কারণ?

নিজের আনন্দকে ব্যবসার খাতিরে ফলাও করে প্রচার করা আর কি। তাতে জাতও যায় পেটও ভরে না।

কেন?

যে পয়সা খরচ করে আসেন, ছবি তোলায় আর মন ভোলানো লেখায় তা উশুল হয় না।

কেন?

তাতে যে নিজের দেখা হয় না।

কাঞ্চনের এ-কথায় রাগিণী প্রশ্ন করে,—নিজে না দেখলে অপরকে দেখানো যায় কী?

কাঞ্চন উত্তর দেয়—যায় বই কি! ম্যাজিসিয়ানদের দেখেন নি?

বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে রাগিণী জিগ্যেস করে,—সাহিত্যকে আপনি এই চোখে দেখেন?

হেসে কাঞ্চন উত্তর দেয়,—সব ক্ষেত্রে নয়। সাধারণের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে আধুনিক লেখকদের লেখা পড়ে এই কথাই আমার মনে হয়,—তাঁদের উপলব্ধি গভীর নয়। অর্থাৎ যে-সমাজ এবং পরিবেশ নিয়ে লেখেন তাঁরা,—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা তাঁদের নিজে চোখে দেখা নয়।

তর্ক হয়তো আরো কিছুক্ষণ চলত, কিন্তু মোটর ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। কাঞ্চনের কথার আর প্রতিবাদ করা গেল না।

'নভেলটি' সিনেমার কাছে 'হিল ভিউ'। পাথুরে রং-এর বাংলো। কেয়ারি করা ফুলের বাগান দু'ধারের জমিতে—মাঝখান

দিয়ে প্রসারিত কাঁকর বিছানো পথ। অনেক রঙের ফুল ফুটে রয়েছে দু'পাশের বাগান জুড়ে। কিছু দূরে বাংলোর গায়েও লতা-পাতা জড়ানো।

কাঞ্চনদের বাড়ি। গেটে এ্যালসেসিয়ন জার্মান কুকুর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ডেকে উঠল—ঘেউ-উ-উ। মোটরের হর্ণের শব্দে সাদা উর্দিপরা নেপালি বয় ছুটে এল—পিছন পিছন এলেন এক সুন্দরী রমণী—পরণে জংলা শাড়ি, তন্বী না হলেও রাশভারি স্থূলাঙ্গী নন আর বয়েস যৌবনকে অতিক্রমও করেনি এখনো। সহাস্যময়ী তরুণী নারী।

কেমন জব্দ ঠাকুরপো! বললাম, যেও না। গুরুজনের নিষেধ-বাক্য তো শুনলে না! এখন শুধু পথের কষ্টই সার। —বললেন কাঞ্চনের বৌদি।

মোটরের ভিতরে চুপচাপ বসেছিল রাগিণী। এতক্ষণের পথের উত্তেজনা এখন আর নেই, বরঞ্চ কেমন যেন একটা সঙ্কোচ এবং ভয় এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

কাঞ্চন অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, তা সে পূর্বেই অনুমান করে নিয়েছে। শুধু অনুমান কেন, তাদের বালিগঞ্জের পাম এ্যাভেন্যু-এর বাড়িতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখেছে, কিন্তু এ-বাড়ি তাকেও যেন অতিক্রম করে গেছে।

ফুলের কেয়ারি করা বাংলো, সামনে গেট—যার নাম 'হিল ভিউ'। এখানে রাগিণী নিতান্তই বেমানান। সাধারণ কেরানিবৃত্তি,—অতি সাধারণ বেশভূষা। এ-সমাজের আদব-কায়দাও অজানা। রাগিণী অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করে। কী অপূর্ব সুন্দরী কাঞ্চনের বৌদি! তাঁর পাশে নিজের চেহারা অত্যন্ত লজ্জা দেয় তাকে। না, ঠিক হয়নি কাঞ্চনের সঙ্গে এখানে আসা!

গাড়ির ভিতর বসে থাকা রাগিণীর দিকে এতক্ষণে লক্ষ্য পড়ল বৌদির। সাশ্চর্যে রাগিণীর প্রতি তাকিয়ে তিনি বললেন—একী,

উনি যে ভেতরে বসেই রইলেন। কাকে সঙ্গে এনেছ কাঞ্চন? এতক্ষণ ওঁর কথা তো কিছুই বলো নি। ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জার কথা!

বৌদির কথায় কাঞ্চন হেসে বলল,—নাকের বদলে নরুণ। অর্থাৎ তোমার বোনের বদলে সুস্মির বন্ধু। যাচ্ছিলেন দার্জিলিঙ। নিয়ে এলাম কালিম্পং।

বেশ করেছ। বৌদি রাগিণীকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জানলেন,—এসো ভাই, ভেতরে এসো। সুস্মির বন্ধু, তাই তোমাকে আপনি বলতে বাধছে।

রাগিণী পুলকিত হল।

কাঞ্চনের কথাই ঠিক। সে যে বলেছিল,—দেখবেন আমার বৌদিকে। দেখবেন কত ভালো, কত মিষ্টি স্বভাব তাঁর। না, একটুও অতিরঞ্জিত নয়, একটুও বাড়িয়ে কিছু বলেনি কাঞ্চন।

গাড়ি থেকে নেমে বৌদির পদধূলি নিল রাগিণী।

বৌদি সস্নেহে জড়িয়ে ধরলেন রাগিণীকে,—সুস্মির বন্ধু তুমি। এ-বাড়ি তোমার নিজের জায়গা। লৌকিকতা করতে পারব না ভাই তোমার সঙ্গে। আর আপনি আজ্ঞে—

বৌদির কথায় প্রবল বাধা দিয়ে রাগিণী বলল,—সে কী! আপনি-আজ্ঞে করবেনই বা কেন? আমি আপনায় চেয়ে শুধু বয়েস নয় সব দিক থেকেই কত ছোট!

ছোট কি বড় জানিনে। জানলাম তুমি সুস্মির বন্ধু। আমার প্রিয় ননদিনী, কিন্তু ভাই রায়বাঘিনী হয়ো না যেন!

কাঞ্চন হাসছে।

তারপরই অভিযোগের কণ্ঠস্বর—আশ্চর্য মেয়ে তোমার বোন বৌদি। শিলিগুড়ি রেল স্টেশনে কী দুর্ভাবনা! আসাম লিঙ্ক পৌঁছল,—সবাই আছে, নেই কেবল—

বৌদি বললেন,—ওমা! তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি। তপতী ট্রেন মিস করে টেলিগ্রাম করেছে। কাল বৃহস্পতিবার।

কালকে বাদ দিয়ে পরশুদিন সে আসাম লিঙ্ক ধরবে, শনিবার এখানে এসে পৌঁছবে। আর তোমাকে জানাতে বলেছে, এসেই সে এখান থেকে শিলং যাবে। তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে।

তাই নাকি? এদিকে আমি দুর্ভাবনায় মরি। এই ভদ্রমহিলা সাহস দিলেন তাই! ইনিও বলেছিলেন যে তপতী ঠিক ট্রেন মিস্ করেছে।

কাঞ্চনের কথায় বৌদি হাসলেন। ফরসা ধবধবে মুখখানিতে ঈষৎ সোনালি আভা। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে।

মালপত্তর নামানো হল। সেই সুটকেসের সঙ্গে বিছানার বাণ্ডিল। তাও একটা সতরঞ্চি মোড়া। কী বিশ্রিই যে দেখাচ্ছে! রাগিণীর তা দেখে নিজেরই লজ্জা করতে লাগল।

ফের কাঞ্চন বলল, স্টেশনে এঁর সঙ্গে আলাপ। পরিচয়ে জানলাম আমাদের সুস্মিতার বন্ধু, লেডী ব্রাবোর্ণে একসঙ্গে পড়তেন।

ও, তাই নাকি। তা বেশ, বেশ!

কাঞ্চন আবার বলল, যাচ্ছিলেন দার্জিলিঙে। আমিই জোর করে টেনে আনলাম।

বেশ তো। দু'দিন এখানে থেকে দার্জিলিঙ গেলেই হবে।

কথা হচ্ছিল বাংলোর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। মাল-পত্তর বাড়ির ভেতর চলে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়েছিল রাগিণী। কুণ্ঠার ভাব এখনো যেন কাটছে না। সারা পথের মুখরতা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কাঞ্চন রাগিণীকে বলল,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখনো আবার কী ভাবছেন। আর তো পর পর ঠেকবার কথা নয়।

রাগিণী কুণ্ঠার সঙ্গে উত্তর দিল,—পর পর ঠেকবে কেন! এত সুন্দর মানুষ বৌদি। একটুখানি সময়ের মধ্যেই আপন করে নেন।

আর আমি?

তোমার কথায় আর কাজ নেই। মেয়েটি সেই কখন ট্রেনে

চেপেছে,—আগে বাড়ি নিয়ে যাও, খাওয়া-দাওয়া করুক, তারপর আপন-পরের চুলচেরা বিচার হবে।

রাগিণী মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারে না যে বাড়ি আসার আগেই সে সৌজন্য কাঞ্চন দেখিয়েছে।

বৌদি রাগিণীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন,—এসো ভাই, এসো।

কাঁকর বিছানো পথে তিনজনই চলতে লাগল। দু'পাশের বাগানে কত রঙ-বেরঙের ফুল, লতা-পাতা বাড়ির পাথুরে দেয়ালের গায়। একটা ইউক্যালিপ্‌টস গাছের পাতা বাতাসে মৃদু মৃদু নড়ছে। কাঞ্চন আব বৌদি বেশ মিশে গেছেন। জোর কদমে এগিয়ে চলেছেন।

রাগিণীর হল কী?

পা দু'টো যেন আর নড়তেই চায় না।

কী হল! অত পিছিয়ে পড়লেন কেন?

কাঞ্চনের কণ্ঠস্বরে জাগরিত হয়ে রাগিণী দেখল বৌদি বাড়ির মধ্যে চলে গেছেন।

মৃদু হেসে রাগিণী বলল,—পিছিয়ে পড়াটাই আমার স্বভাব।

চার

বিছানাটা আশ্চর্য নরম।

দু'দিনের পথ-ক্লান্তির পর খাওয়া-দাওয়া সেরে একন্ত নির্জন ঘরে এমনি আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে রাগিণী খুবই পরিতৃপ্ত হল। সতরঞ্চি মোড়া বিছানাটি পাতার আর দরকার হয়নি। সুটকেসের পাশে খাটের নিচে সেটি দৃষ্টির অন্তরালে একান্তে পড়ে আছে। এ-ঘরের শয্যা এবং আসবাব পত্তরের মাঝে ওটা একেবারেই বেমানান। বিছানাটির দিকে তাকাতেই লজ্জা বোধ হয়। নিজের দীনতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

খুব ভালো লাগছে। অপ্রত্যাশিত ব্যবহার কাঞ্চনের বৌদির।

যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি পরকে আপন করে নেওয়ার মনোভাব। তা না হলে কোথাকার কী আর এমন সম্পর্ক! তাঁর মাসতুতো ননদের সহপাঠিনী বন্ধু মাত্র! সেই সম্পর্কের স্বীকৃতিতে এত আদর যত্ন আপনজনের মতন আচার-আচরণ সত্যিই বিস্ময়কর। আসতে না আসতেই স্নান সেরে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পর্ব।

নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এমন কি স্বহস্তে পরিবেশন করে বৌদি যত্ন করে খাওয়াতে লাগলেন।

এত ভাত জীবনে কোনদিন খাইনি বৌদি।

সেইজন্যেই তো এমন রোগা চেহারা।

এত মাংস কি করে খাব বলুন তো?

তোমার বয়েসে এটুকু প্রোটিন খাওয়া দরকার। শরীরে শক্তি-সামর্থ তা ছাড়া আসবে কেমন করে?

বৌদির কথায় হেসে ফেলে রাগিণী—যা শক্তি সামর্থ শরীরে আছে তার প্রমাণ কিন্তু স্টেশনে কাঞ্চনদা টের পেয়েছেন।

কাঞ্চন পরিহাসের সুরে বলল,—রোগা হাড়ে ভেল্‌কি খেলে বৌদি, তা না হলে ওই তিরিশ কেজির স্যুটকেসটা নির্বিবাদে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে আসতে পারে কেউ? স্টেশনে একটা কুলির পর্যন্ত দরকার হয়নি ওসব ভারী মালপত্তর বয়ে আনার জন্যে।

বৌদি হাসলেন।

এরই মধ্যে খুব ভাবসাব হয়ে গেছে বৌদির সঙ্গে। ঘর-সংসারের সব কথাবার্তা বলতেও কোন দ্বিধা নেই।

বৌদিই এ বাড়ির আসল গৃহিণী। শাশুড়ি অবিশ্যি আছেন, তবে তিনি নিজের নন। শ্বশুরের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী। এই শাশুড়ির বোনের মেয়ে হচ্ছে সুস্মিতা। লেডী ব্রাবোর্ণে একসঙ্গে কিছুদিন পড়েছে তার সঙ্গে। কলকাতায় এখনো কাজ কারবার আছে। বাড়িও বেশ জমকালো। হার্ডওয়ার বিজ্‌নেস। সে ব্যবসা দেখে

এই শাশুড়ির দুই ছেলে। বর্তমানে সে ব্যবসার বাজারে মন্দার দশা। তবুও মরা হাতী লাখ টাকা।

রাগিণী সুস্মিতার আপন মাসতুতো দু'ভাইকে দেখেনি। দেখেছিল শুধু কাঞ্চনকে। আর কাঞ্চনকে দেখে একটুও মনে হয়নি যে সে বুঝি সুস্মিতার আপন মাসির ছেলে নয়।—সৎমায়ের ছেলে বলে বুঝতে পারা যায়নি। আর সুস্মিতাও ঘরেব কথা বন্ধুকে এমন করে বলে নি—যা বৌদি আজ অকপটে ব্যক্ত করলেন।

কাঞ্চনের দাদা অনেক দিন থেকেই কালিম্পং-এ আছেন। এখানে তিনি একজন নামকরা কনট্রাকটর। শুধু এই পার্বত্য অঞ্চলেই তাঁর কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ নয়। উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জায়গা—শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুর ডুয়ার্স জুড়ে তাঁর কনট্রাকটরি বিজনেস প্রসারিত। হিলসে কালিম্পং এবং প্লেনে জলপাইগুড়িতে দু'খানি বাড়ি। বছরে দুবার ওঠা-নামা করেন।

বৌদির দু'টি ছেলে এবং একটি মেয়ে—দার্জিলিঙ-এ থেকে পড়াশুনা করে। রাগিণী যেদিন সুস্মিতার সঙ্গে কলকাতা বালিগঞ্জে পাম এ্যাভেন্যুর বাড়িতে গিয়েছিল সেদিন সে এঁদের দেখিনি,—কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ির পরিবার-পরিজন সম্পর্কে কোন কথাও শোনে নি।

কাঞ্চন তখন বি, এস, সি পাশ করে বালিগঞ্জের বাড়িতেই ছিল। তার বাবা জীবিত ছিলেন। বাবা চাকরি-বাকবি নিতে দেন নি এ ছেলেকে।—চাকরি করে কি হবে এমন সোনার খনির কারবার থাকতে! দোকানের কাজকর্ম বুঝে সুঝে নিতে পারলে কলকাতার সংসার রাজার হালে চলে যাবে।

কাঞ্চনের নিজের ভাই বড়দার এতে ঘোরতর আপত্তি ছিল। সৎমায়ের ছেলের সঙ্গে বাপের অবর্তমানে কতদিন সৎ-সম্পর্ক বজায় থাকবে তা সন্দেহের ব্যাপার। কিন্তু বাবার মুখের ওপর সে কথা বলা যায় নি কিছুতেই।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বড়দা নিয়ে এলেন ভাইকে নিজের কাছে

এখানে। কনট্রাক্টরি বিজ্‌নেস যুদ্ধের দৌলতে ফেঁপে উঠেছে। একলা আর তিনি সামলাতে পারছেন না। আর বি, এস, সি, বি, ই পাশ করা সিভিল ইঞ্জিনিয়র ভাই সঙ্গে থাকলে তিনিও নিশ্চিন্ত হন।

দেখতে দেখতে এই ব্যবসায় ফেঁপে উঠেছে কাঞ্চনও। এখন সে নিজের রোজগারে আত্মপ্রতিষ্ঠিত।

বড়দার ইচ্ছে এইবার ভাইয়ের বিয়ে দেন। পাত্রীও নির্বাচিত। বৌদির কাজিন তপতী বেশ পছন্দসই মেয়ে। অবিশ্যি লেখাপড়ায় চৌখস নয়। কোন রকমে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। কলেজেও ভর্তি হয়েছিল। মাঝে মধ্যে যখন সখ চাপে বইখাতা নিয়ে ক্লাশ করে, রেগুলার স্টুডেন্ট নয়। আর তপতীদের বাপের বাড়িতে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার রেওয়াজ এখনো হয়নি। ম্যাট্রিক পাশ করেছে, মেয়ে কলেজের মুখও দেখেছে—এই তো যথেষ্ট! মোটা মোটা বই-এর পেষণে শরীর এবং মনকে পিষ্ট করা। কেন বাপু, মেয়ে তো আর চাকরি-বাকরি করতে যাবে না যে অন্তত গ্রাজুয়েট হওয়া চাই! তবে?

লেখাপড়ায় তপতীর আগ্রহ নেই মোটেই। তার চেয়ে নাটক নভেল নিয়ে দিন কাটানো অনেক ভালো। লজিকের ডিডাকটিভ আর ইন্‌ডিডাকটিভ তত্ত্ব কিছুতেই তার মাথায় আসে না। কিংবা কমারসিয়াল জিয়োগ্রাফির কাস্ট আয়রণ—অতি নীরস বস্তু। তার চেয়ে বরঞ্চ গান-বাজনায় বেশি ঝোঁক। সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীতে দক্ষতা এবং সেতারও বাজায় ভালো। রেডিওতে মাঝে মাঝে সেতার বাজানোর প্রোগ্রাম থাকে।

বাপের একমাত্র মেয়ে তপতী। শুধু কলকাতাতেই তিনখানি বাড়ি। খাস কলকাতায় বুকে বড় বাজারের তেলের আড়ৎদার। অনেক রোজগার, অনেক টাকা। কলকাতার বাইরে পুরী, দেওঘরে বাড়ি আছে অবকাশ যাপনের জন্যে। বাপের একমাত্র আদরের মেয়ে। তপতীকে বিয়ে করলে সব সম্পত্তির মালিক হবে কাঞ্চন,—রাজকন্যার সঙ্গে রাজত্বও।

বৌদির মুখ থেকে এরই মধ্যে সব কথাই শুনেছে রাগিণী। কাঞ্চনের সার্থকময় জীবনের সার্থকতম প্রত্যাশা। এমন মেয়েকে বিয়ে করতে কোন পুরুষেরই না লোভ হয়? সাধ করে কী কাঞ্চন অত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তপতীর জন্যে শিলিগুড়ি স্টেশনে। ব্যস্ত তো হবারই কথা!

কিন্তু তা সত্ত্বেও রাগিণীর প্রতি কাঞ্চনের সৌজন্যবোধও কম নয়। অতিথিকে বাড়ির মধ্যে পছন্দসই একখানা স্বতন্ত্র ঘর দেওয়া দরকার। কোন ঘরখানি রাগিণীকে থাকতে দিলে তার কোন অসুবিধে হবে না সে চিন্তাও কম কিছু নয়। খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, এখন বস-বাসের জন্যে একটি নির্দিষ্ট ঘরের প্রয়োজন। সেই ব্যবস্থায় উদ্যোগী হল কাঞ্চন।

বৌদি বললেন—সরকার মশাইয়ের ঘরের পাশের ঘরটি মন্দ কী? বেশ তো ছোটখাট ঘর। দিব্যি আরামে থাকা যায়। জানলা দিয়ে দেখ—যতদূর চোখ যায়। পাহাড় দেখতেই তো এসেছে।

রাগিণী পরম আপ্যায়িত হয়, ওই ঘরটি আমার পক্ষে ভালো বৌদি।

কাঞ্চন আপত্তি করে,—না। ওটা যেন বাইরের ঘরের সামিল। আর ওঘর থেকে তিস্তাকে দেখা যায় না। তার চেয়ে ভেতরের ওই পশ্চিম কোণের ঘরখানা ঠিক করে দাও। তিস্তার প্রতিই ওঁর লোভ বেশি।

কাঞ্চনের কথায় বৌদি হাসেন।

ভারি অপ্রস্তুত করে তোলেন মানুষকে আপনি। সারা রাস্তা শুধু তিস্তাই দেখেছি?—ঈষৎ উষ্ণ কণ্ঠে রাগিণী বলে।

তা নয় তো কী? সারা পথ আপনি তো শুধু নিচের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। করোনেশন ব্রীজে এসে তিস্তা নিয়েই মেতে রইলেন।

আরো রেগে যায় রাগিণী,—আপনি হয়ত জানেন না, আমাদের

দেশে শুধু নদী আর নদী। পদ্মা মেঘনার পাশে এই তিস্তা? নদী দেখে দেখে চোখ আমার পচে গেছে।

বলেন কী?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি।

না। ঠিক বলেন নি। আমি জানি আপনি মনের কথা লুকোচ্ছেন।

হঠাৎ এক বেফাঁস কথা রাগিণীর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে। কাঞ্চনের কথায় সে জিগ্যেস করে, আপনি কি অন্তর্যামী?

কাঞ্চন সহজ সরল হাসি হেসে উত্তর দেয়, অন্তর্যামী না হলেও মনোবিজ্ঞানী।

মধ্যস্থতা করেন বৌদি, তর্ক থাক। সারা রাতের ট্রেনের জার্নি। এখন ওর বিশ্রাম দরকার।

রাগিণী তবু বলে, না বৌদি, আপনার কথা মত আমি সরকার মশাই-এর পাশের ঘরেই থাকব। ওখানেই আমার মালপত্তর নিয়ে যাই।

কাঞ্চন বাধা দেয়, আপনি অতিথি। ওসব ভার আমাদের।

বৌদি কী চটলেন? রাগিণীর কেমন যেন সন্দেহ হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পশ্চিম কোণের ঘরখানিতে এসে রাগিণী খুশিই হয়ে ওঠে।

এই ঘরেই এখন শুয়ে রয়েছে সে। কাঞ্চনের নির্বাচিত ঘর। কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যায় ওপরে মেঘ আর পাহাড়—নিচে সরু রেখায় রূপালি হারের মতন তটিনী বয়ে চলেছে—পর্বতকন্যা তিস্তা। আর দিগন্তজোড়া শুধু পাহাড়, ফুল আর রঙ। উত্তরের জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘাকেও দেখা যাবে। এখন মেঘে ঢাকা আছে।

সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘর। খুব পছন্দ হয়েছে রাগিণীর। ঝকঝকে পালিশ করা মেঝেতে মুখ পর্যন্ত দেখা যায়। একটা ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ডরোবের মধ্যে কাপড়-জামা রাখবার জায়গা। লম্বা এবং প্রশস্ত

ডিভান, খুব আরামে শোওয়া যায়। রাগিণী বসতে গিয়ে দেখে—স্প্রিং-এর গদি, অনেকখানি নেমে যায়। ঘরের মধ্যে দু'টি কুশন চেয়ার,—ছোট্ট একটি রাইটিং টেবিল। ফ্লাওয়ার ভাসে নানা রঙ বেরঙয়ের মৌসুমী ফুল,—কয়েকটি টাটকা গোলাপও। সুন্দর গন্ধ ছড়াচ্ছে। ঘরের দেয়ালে সুন্দর সুন্দর ল্যাণ্ডস্কেপ। দৃষ্টির এক লহমাতেই ঘরখানি ভালো লাগে। আভিজাত্যের ছোঁয়ায় মন ভরে ওঠে।

কাঞ্চন চলে গেল ঘর ছেড়ে—এবার একটু বিশ্রাম নিন।

ডিভানের আরামদায়ক সুপরিচ্ছন্ন শয্যায় গা ঢেলে দেয় রাগিণী। পথক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহটিকে এই সুকোমল শয্যায় এলিয়ে দিয়ে মনে মনে আরেকবার ধন্যবাদ জানাল সুস্মিতার দাদাকে—যিনি সত্যিই এত সমাদরে এখানে থাকার সুবন্দোবস্ত করেছেন।

কলকাতা থেকে এখানে আসার পথক্লান্তি, ট্রেনে রাত্রি জাগরণ,—স্নান এবং আহারের পর এমন আরামের বিছানায় শুয়ে এখন ঘুমিয়ে পড়ারই কথা রাগিণীর। কিন্তু হঠাৎ এ আবার কি হল তার? সে কী সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে? না, ঠিক যেন ঘুম নয়। চোখের পাতা দু'টি বোজা। সত্যিকারের ঘুম কোথায়? তন্দ্রার ভাব খানিকটা আছে, ঘুম তাকে বলা যায় না।

রাগিণী কী স্বপ্ন দেখছে এখন?

সুখাদ্যে উদর পূর্তি করে ডিভানের এই নরম বিছানায় শুয়ে আরামের দিবা নিদ্রা। সেই ঘুমের মধ্যেই সে স্বপ্ন দেখছে, সুখকর স্বপ্ন এক!

জেগে নেই সে। জেগে থাকলে এমন সময় হঠাৎ তার যে জীবনের ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠছে, সে জীবন তো কত পিছনের।

কী আশ্চর্য, এ কোথায় রয়েছে সে এখন? এ তো কালিম্পং-এর পরিবেশ নয়। পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে হঠাৎ সে বিহারের সাঁওতাল পরগণায় চলে এল কেমন করে?

দেওঘরের বম্‌পাস টাউন। বম্‌পাস টাউনের পুলকেশের কথা এখন তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে আছে কেন? কলকাতার পার্ক সার্কাসের বাড়ির কথা—বাপ মা ভাই-বোনের কথা, আপিসের সহ-কর্মীরা কিংবা কলকাতার একান্ত কাছের জন শিশির—না, কারুর কথাই আর এখন মনে নেই। এমন কী যার সৌজন্যে কালিম্পং-এ আসা—এমন একটা উন্নত জীবনের আস্বাদন, তার ছবিও আশপাশে দেখছে না রাগিণী।

কাঞ্চনকে অতিক্রম করে পুলকেশই এখন তার হৃদয় মন আচ্ছন্ন করে আছে।

দেওঘরে গিয়েছিল রাগিণী।

পুজোর ছুটিতে কলেজ বন্ধ। মাসিমার ইচ্ছে ক'দিন একটু বাইরে ঘুরে আসা যাক্। কাছাকাছি জায়গাই ভালো। দেওঘরে যাওয়াই সাব্যস্ত হল। তীর্থভ্রমণ হবে আবার স্বাস্থ্যকর জায়গাও বটে।

মাসিমা গিয়ে উঠেছিলেন তাঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি—বম্‌পাস টাউনে। মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারের সেকেণ্ড ক্লাস লেডীস্ কম্পার্টমেণ্ট থেকে বৈদ্যনাথধাম রেলওয়ে স্টেশনে নামতেই যে ছেলেটি এসে হেসে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল—তার নাম পুলকেশ মুখার্জী। মাসিমার স্বামীর মামাতো বোনের ছেলে। সুন্দর সুঠাম গড়ন—মুখকান্তি কমণীয়তায় ভরা। মধুর স্বভাব। খুবই মিশুকে। অল্পক্ষণের আলাপে আপন করে নেয়। একটু মেয়েলিপনা কথাবার্তায়। তার সুঠাম দেহের গড়নের সঙ্গে পুরুষালী ভাবের তেমন মিল নেই যদিও কিন্তু নবীনতা আছে—উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ তার চোখে মুখে, আলাপ আলাপনে। তাই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এই কোমল যুবকটিকে আঠার উনিশ বছরের কুমারী রাগিণীর প্রথম চোখের চাওয়াতেই ভালো লেগেছিল।

রেল স্টেশন থেকে ট্যাক্সিতে চেপে বম্‌পাস টাউনের 'মধুস্মৃতি'তে

নামা। মাসিমার ননদের বাড়ি। ননদাই বিহার গভর্ণমেণ্টের বিশিষ্ট রাজকর্মচারী। বাড়িটি বেশ, যেমন ঝক্‌ঝকে তেমনি সুদৃশ্য।

মাসিমাকে দেখে তাঁর ননদ খুবই খুশি হলেন, কী সৌভাগ্য দিদি! আপনি এসেছেন।

শুধু আমি একা নইরে বিনোদিনী, সঙ্গে কাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি দেখ।

ওমা। তাইত।

মাসিমার কথায় রাগিণী বিনোদিনী দেবীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল।

মাসিমা রাগিণীকে উদ্দেশে করে বললেন, ইনিও তোমার আরেক মাসিমা।

রাগিণীর চিবুক ধরে চুমু খেয়ে বিনোদিনী দেবী আশ্বাস জানালেন, পর নই মা তোমার।

কী খুশি সকলে। আর আনন্দ!

পুলকেশ জিগ্যেস করল, তা হলে আমি কী হলাম?

মাসিমা উত্তর দিলেন, কেন দাদা।

কই দাদা বলে তো আমাকে প্রণাম করে নি আপনার বোন ঝি। পুলকেশের কথায় খুব অপ্রস্তুত হয়েছিল রাগিণী। তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে সে প্রণাম করল।

পুলকেশের পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ করতেই তার হাতখানি কেমন না জানি একটু কেঁপে উঠেছিল।

কী উচ্ছ্বাস তখন পুলকেশের। কোন ঘরে রাগিণী থাকবে তাই নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা—ওই উত্তরের ঘরটিই ভালো মা।

কেন পূবের ঘর কী খারাপ?

মায়ের কথার প্রতিবাদ জানিয়ে পুলকেশ বলেছিল, না মা, পূবের ঘর ভালো হলেও ওখান থেকে পাহাড় দেখা যায় না।

ছেলের কথায় মা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, দেওঘরে আবার দেখ-

বার মতন পাহাড় কোথায়? পাহাড় দেখতে গেলে যেতে হয় সিমলে, হরিদ্বার, কুলু মানালী কিংবা দার্জিলিঙ।

সে তো অনেক দূরের পথ। দেওঘরের ত্রিকূটও হেলা ফেলার জিনিস নয়। উত্তর দিকের ঘর থেকে ত্রিকূটকে ভারি সুন্দর দেখায় কিন্তু।

ত্রিকূট সম্পর্কে কোন ধারণা ছিলনা রাগিণীর। পুলকেশের কথায় সে জিগ্যেস করল, ত্রিকূট আবার কী?

ত্রিকূটের নাম শোন নি? চলো, দেখবে চলো।

তক্ষুণি রাগিণীর হাত ধরে পুলকেশ তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাড়ির উত্তর দিকের ঘরে। মধ্যাহ্ন রৌদ্রের উজ্জ্বল আলোয় ত্রিকূট তখন উদ্ভাসিত। ধূসর পাহাড়ের ঢেউ খেলানো রূপ সূর্যের আলোয় ঝক্ ঝক্ করছে।

রাগিণীর জীবনে এই প্রথম পাহাড় দেখা।

পূর্ব বাংলার নদী-মাতৃক ভূমিতে অধিবাস। জন্মকাল থেকে নদীর সঙ্গে পরিচয়। নদ-নদী, খাল-বিল—বর্ষায় জল প্লাবিত গ্রাম। যদিও বিক্রমপুরে বেশিদিন থাকা হয় নি। বারো বছর বয়স থেকেই সে কলকাতায়।

মাসি গিয়েছিলেন পূজোয় তাদের বাড়িতে ঢাকা বিক্রমপুরে। কী চোখে যে দেখলেন রাগিণীকে! মেসোমশাই তখন জীবিত। কলকাতার এক প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ মার্কেনটাইল অফিসের বড় বাবু। মাসি নিঃসন্তান। স্বামী-স্ত্রীতে কলকাতায় পার্ক সার্কাসের নিজস্ব বাড়িতে থাকেন। সংসারে আর কেউ নেই। মেসোমশাই নির্ঝঞ্ঝাট লোক, বেশি ভিড় পছন্দ করেন না। এক সহোদর ভাই তাঁর অবিশ্যি আছে; কিন্তু দজ্জাল ভ্রাতৃ-বধূ—মাসিমার সঙ্গে কিছুতেই বনিবনা ঘটেনি। বিশেষ করে দেওরের বখাটে ছেলেকে তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন নি। মায়ের আদরে ছেলে বখে যাচ্ছে—মাসিমা তাকে শাসন করতে গেলেই কুরুক্ষেত্র বেধে যায়। আর তাই নিয়েই সংসারে অশান্তি।

সে অশান্তির চেয়ে ভাই-ভাইয়ে পৃথক হওয়া অনেক ভালো। বাড়িটি মেসোমশাই-এর স্বোপার্জিত অর্থে নির্মিত। ছোট ভাই স্ত্রী পুত্র নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন দেশের পৈত্রিক বাড়িতে। দেশও কলকাতার কাছে পিঠেই। দক্ষিণবঙ্গের কালিকাপুর গ্রামে। দাদার অফিসেই চাকরি। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা চলে। কলকাতায় থাকার সুখের চেয়ে গ্রামের বাড়ির শান্তির আশ্রয়ই ভালো। কলকাতার পার্ক' সার্কাসের বাড়িতে নিঃসন্তান মেসোমশাই মাসিমা থাকেন আর চাকর ঠাকুর—এই নিয়েই সংসার। এ সংসার বড় ফাঁকা। মেসো-মশাইয়ের ভালো লাগলেও মাসিমার ভালো লাগে না।

মায়ের আপন পিস্‌তুতো বোন মাসি। বাপমায়ের এক মেয়ে। রাগিনীর মা তাই তাঁর নিজের বোনেরই সামিল।

মাসি সদা হাসি খুশি, ভারি ভালো আর আমুদে স্বভাবের। বারো বছরের মেয়ে রাগিণীর সঙ্গেই খুব জমে গেলেন ক'দিনের জন্যে পূর্ববঙ্গের খোলা মেলা প্রকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা ঢাকা বিক্রমপুরে এসে।

রাগিণীর বাবা জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারী। ঘুষ-টুস নিয়ে তখন তাঁর ফেঁপে ওঠা সংসার। জমি-জায়গাও কিছু করেছেন। ক্ষেতের চাল, পুকুরের মাছ, পোষা গরুর খাঁটি তুধ আর গাছের ডাব-নারকেল—মেসো মাসি ভারি আপ্যায়িত হলেন।

একমাস প্রায় ছিলেন। সর্বক্ষণ রাগিণী তাঁদের কাছে কাছে থাকত। কলকাতায় ফিরে যাওয়ার দিন তাঁর চোখ ছল ছল করে উঠল। রাগিণীকে যে কী চোখে দেখেছিলেন তিনি! বিদায়ের দিনে সারা সকাল থেকেই মন তাঁর বিষণ্ণ,—ডাগর ডাগর চোখ তুটি জলে ভরে ওঠে যতবার রাগিণীকে ধারে কাছে পান। শেষে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা'র হাত তু'টো চেপে ধরে বললেন, তাই তো নলিনী, কলকাতায় ফিরে গিয়ে রাগিণীকে ছেড়ে থাকব কেমন করে? মেয়েটা এত নেওটা হয়ে গেছে। নাঃ, তোর এখানে না এলেই ছিল ভালো।

হু'জনের সংসারে হু'জনে ছিলাম ভালো। এখানে এসে তিনজন যে কী জিনিস নতুন করে টের পেলাম।

মাসির ডাগর চোখে জল দেখে মা বললেন, তার জন্মে আর হুঃখ কেন শোভনাদি! রাগিণীকে তুমি নিয়ে যাও।

প্রথমটায় কথার সুরে হয়ত হাল্কা ভাবই ছিল, ক্রমশ তা গভীরতায় ভরে উঠল।

সত্যি বলছিস্?

ওমা, তোমার সঙ্গে কী মিছে কথা বলছি নাকি?

রাগিণীকে ছেড়ে তুই থাকতে পারবি?

কেন পারব না? ওকে তো আর পরের হাতে বিলিয়ে দিচ্ছি নে। বাপ-মায়ের কাছে না থেকে থাকবে মেসো-মাসির কাছে। এতে আর অসুবিধে কোথায়?

ও কিন্তু আমার মেয়ে হয়ে যাবে।

যাক্ না। ও-ছাড়াও তো আমার আরো ছেলে-মেয়ে রয়েছে।

তবে পাকাপাকি কথাবার্তা বলে নে। আর তো সময় নেই। আজই বিকেলের গাড়িতে আমরা যাব।

শোভনা মাসির কথা শুনে মা হেসে গড়িয়ে পড়লেন—কাঁচা কথা বলেছি নাকি?

না।

তবে আবার কী? দলিল দস্তাবেজ বানাতে হবে? বলো তো উকিল ডাকি না হয়।

নারে, হাসি-ঠাট্টার কথা নয় কিন্তু!

মা এবারে গভীর সুরে বলেন, আমিও ঠাট্টা করিনি শোভনাদি। তোমার ছেলে-পিলে নেই। অবস্থার দিক থেকে জামাইবাবু এত সচ্ছল। নাও না কেন আমার এই মেয়েটিকে। মানুষ করে দিও। তোমার কাছে থাকলে ও মানুষের মতন মানুষ হয়ে উঠবে।

প্রস্তাব শুনে মেসোমশাইও খুশি হলেন। সেই থেকেই জীবনের পট পরিবর্তন।

নদী-মেখলা দেশ থেকে শহরের রাজপথ। দু'চোখ ভরা সবুজ ধানের ক্ষেত আর নেই। নেই প্রশান্ত আকাশের বিস্তার। তবুও এই কলকাতাই ভালো লেগেছিল রাগিণীর। মাথার দু'পাশে চুলের বিনুনি ঝুলিয়ে স্কুলের বাসে চেপে মেমসাহেবের স্কুলের পড়তে যাওয়া। জনারণ্য মহা-নগরী, তাই বেশি করে আকর্ষণ করেছিল রাগিণীকে।

তের বছরেব মেয়ে। গ্রাম দেখলে তখন থেকেই নাক সিঁটকাতো—ম্যাগো, কী বিচ্ছিরি গাঁ। এখানে আবার মানুষ থাকে নাকি। ইলেক্‌ট্রিকেব আলো নেই, টিমটিমে লণ্ঠনের আলো!

বিক্রমপুরের বাড়ি আব তার ভালো লাগে না। ছুটিতে বাপ-মায়ের কাছে এসে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে যেন; দু'চাব দিন থাকতে না থাকতেই পালাই-পালাই ডাক ছাড়ে রাগিণী।

মা বলেন, তুই কী হলি বে। ক'দিনেই একবারে শহুরা মাইয়া! রাগিণী উত্তর দেয়, তা কী করব। তোমাদের এখানে ভয়ানক গরম। টিনের চাল—সিঁড়ি নেই, ছাদ নেই। আর ফ্যানের হাওয়া ছাড়া আমি থাকতে পারি নে।

দু'চার বছর বাদে রাগিণী ছুটিতে আর বিক্রমপুরে মা-বাবার কাছে আসত না। মাসিও তাকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না।

রাগিণীর বাবা এতে খুশিই ছিলেন। জমিদার সেরেস্তার হিসেবী লোক। মেয়ে যদি কলকাতার বড় লোক মেসো-মাসির মন জুগিয়ে থাকতে পারে তা হলে শুধু তারই মঙ্গল নয়, সমস্ত সংসার তাতে উপকৃত হবে। ভালো বর ঘরে বিয়ে থা দিয়ে দেবে মাসি। তাঁকে সেজন্যে এক পয়সাও ব্যয় করতে হবে না। শুধু তাই নয়, চাই কী কলকাতায় পার্ক সার্কাসের অমন বাড়িখানি পর্যন্ত হস্তগত হতে পারে।

খুবই আনন্দে ছিল রাগিণী।

ম্যাট্রিক পাশ করবার আগেই মেসোমশাই পরলোক গমন করলেন। রাগিণী হল মাসির চোখের মণি।

সেই সময় আর একবার বিক্রমপুরে মাসি এসেছিলেন রাগিণীকে সঙ্গে নিয়ে। মাস খানেক ছিলেন।

কথায় কথায় মা বলেছিলেন, শোভনাদি, এবার মেয়ের বিয়ে দেওয়া কী ভালো নয়?

মাসি বললেন, খেপেছিস? এর মধ্যেই বিয়ে কী রে?

পনের বছর বয়েস হল যে রাগিণীর!

আজকালকার দিনে মেয়েদের আবার পনের বছর বয়েস নাকি? তোদের সময় আমাদের সময় তা ছিল বটে। এখন আর তা নেই।

তা মেয়ে তোমার করবে কী?

কেন? পড়াশুনা করবে। ম্যাট্রিক. আই-এ, বি-এ, এম-এ পর্যন্ত।

তারপর?

তারপর বিয়ে থা করে ঘর-সংসার পাতবে।

বিয়ে করে ঘর-সংসারই যদি করতে হয় তবে আর এত লেখাপড়া কেন? লেখাপড়া শিখে পাশ করে হবেই বা কী?

তুই তা বুঝবি কী? তোরা পাড়াগাঁয়ে থাকিস, লেখা পড়ার মর্যাদা তোরা বুঝবি কেমন করে?—মায়ের কথায় মাসি রুখে উঠেছিলেন।

মা বলেছিলেন, হ্যাঁ, তা বটে। তবে তোমার থেকে আমার সংসার-বুদ্ধি অনেক বেশি দিদি। ওই মেয়ে করবে এম-এ পাশ? তোমার যেমন আকাশ-কুসুমের কল্পনা!

মায়ের কথায় মাসি জবাব দিয়েছিলেন, তুই তো সব জানিস। দেখিস এম-এ পাশ করে কিনা। এবারের ক্লাশের পরীক্ষার রেজাল্ট জানিস?

রাগিণী সেকেণ্ড হয়েছে। রাগিণী তখন ক্লাশ টেনের ছাত্রী।

মাসিমার কথা শুনে মাও মেয়ের কৃতিত্বে খুশিই হয়েছিলেন। রাগিণী ফার্স্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল সেই বছরেই।

রাগিণীর চেয়ে মাসিরই যেন আনন্দ বেশি। রেজাল্ট প্রকাশ হতে রাগিণীর বাবা কলকাতায় এলেন ক'দিনেব জন্যে। মুখে বললেন, অন্য কথা,—জমিদারি সংক্রান্ত কাজে নাকি আসতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য জানা গেল যখন তিনি একান্তে মাসিকে পার্ক-সার্কাসের বাড়ি সম্পর্কিত প্রসঙ্গেব উত্থাপন করলেন,—দিদি, দাদাতো আপনার নামেই বাড়িটি উইল করে গেছেন,—কিন্তু ঈশ্বর না করুন, আপনার যদি হঠাৎ কিছু ঘটে যায় তা হলে এ-বাড়িতো—

মাসি সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিলেন, সে আমি জানি।

রাগিণীর বিয়েব ব্যবস্থা কিছু করলেন না তো।

মাসি চটে উঠলেন, যে মেয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে তাকে লেখা পড়া ছাড়িয়ে দিয়ে সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে-থা দেওয়া অবিবেচকেব কাজ।

কিন্তু রাগিণীব জন্যে তা হলে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করা কী এই সময়েই উচিত নয়? আপনি অবিশ্যি যতদিন থাকবেন কোন দুশ্চিন্তাই নেই,—তবে মানুষেব পরমায়ুব কথা তো কিছুই বলা যায় না। অন্তত কলকাতাব এই বাড়িটির একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা দরকার?

মাসি হেসে জবাব দিয়েছিলেন,—জমিদারি সেরেস্তায় চুল পাকালেও আমাকে এ-বিষয়ে উপদেশ দিতে এসো না ললিত, বৈষয়িক বুদ্ধি আমার কিছু কম নয়।

মুখে হাসির ছোওয়া লেগে থাকলেও কণ্ঠস্বরে তাঁর একটু শ্লেষেব উত্তাপ ছিল। জীবিত কালেই সব হাত-ছাড়া কবা উচিত নয়। মৃত্যু সন্নিকট হলে বুঝে-সুঝে উইল-পত্তর করবেন।

ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে আই-এ পড়বার সময় মাসির সঙ্গে রাগিণী গেল দেওঘরে। মেসোমশায়ের মৃত্যুর পর মাসি এক নাগাড় আর বেশি দিন পার্ক সার্কাসের বাড়িতে থাকতে পারতেন না। প্রাণ তাঁর হাঁপিয়ে উঠত।

বৈধব্য ঘটবার পর প্রথমে রাগিণীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন বিক্রমপুর। তারপর কাছাকাছি তারকেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর—দু'চারজন আত্মীয়স্বজনের কাছে যেতেন। এক জায়গায় বেশি দিন আর থাকতে পারতেন না। মন যেন হাঁপিয়ে উঠত। সব সময়ে রাগিণীকে সঙ্গে নিতেন না,—তার পড়াশুনার ক্ষতি হবে। আর ঝি-চাকর নিয়ে পার্কসার্কাসের বাড়িতে রাগিণী একা একা থাকার অভ্যাস করুক। আজকালকার মেয়েদের জীবনে এ-শিক্ষার দরকার।

দেওঘরের বমপাস টাউন। ঝাউগাছ ঘেরা লাল সুরকির রাস্তা, —পিছনে শিলাস্তূপ। সামনে নন্দন পাহাড় আর উত্তরে ত্রিকূটের ধূসর রেখা। আরো পাহাড় আছে—চোল পাহাড়। ধারোয়ার ঝির ঝিরে জল পার হয়ে সেখানে যেতে হয়।

পুরো দেড়মাস রাগিণী মাসির সঙ্গে ছিল সেখানে—দেওঘরে বম্‌পাস টাউনে 'মধুস্মৃতি' ভবনে। রাগিণীর জীবনের সে এক মধুময় স্মৃতি।

মধু পুলকেশের বড় ভাই। শোভনা মাসির ননদের বড় ছেলে। সেই ছেলের পর দ্বিতীয় সন্তান পুলকেশ। মধুর ভাই পুলকেশ। নামে মিল নেই, কিন্তু সামঞ্জস্য আছে দু'টি নামের অর্থ বোধে।

মধু চার বছরের ছেলে। প্রথম সন্তান বলে মধুর মতন মিষ্টি কিংবা মধুসূদনের অপভ্রংশও হতে পারে। সেই ছেলে চার বছর বয়সে মারা গেল। শোকাচ্ছন্ন পরিবারে তখন নব পুলকের সঞ্চার করল পুলকেশ। মধুহীন শূন্য গৃহে মায়ের কোল আলোকিত করে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হল—পুলকিত আনন্দকে সঞ্চারিত করে পুলকেশ এল এ-বাড়িতে। তারপর এ-সংসারে আর কোন সন্তানাদির আবির্ভাব ঘটে নি।

পুলকেশ তখন তেইশ বছরের যুবক। পাটনা য়্যুনিভারসিটি থেকে বি-এ পাশ করেছে। বাপের ইচ্ছে এইবারে তিনি তাকে

কাজে ঢোকাবেন। বিহার রাজ্য সরকারে চাকরি—দেওঘরে নিজস্ব বাড়ি।

দু-চারদিনের মধ্যেই কলকাতার লেডী ব্র্যাবোর্ণে পড়া সেকেণ্ড ইয়ার আর্টসের ছাত্রী রাগিণীর সঙ্গে পুলকেশের ভাব জমে গেল। তপোবনে গিয়ে পিকনিক করা, নন্দন পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া, ধারোয়ার ক্ষীণ স্রোত পার হয়ে নির্জন পথে চোল পাহাড়ে বৈকালিক ভ্রমণ—প্রতিটি দিন বড় মাধুর্যে ভরা।

হৃদয়-বিনিময়ের পালা ঘটল—ত্রিকূটে।

পাহাড়ের অরণ্যময় নির্জন প্রকৃতির মাঝে দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে দেখল—একই অনুরাগের ভাব দু'জনের চোখে মুখে।

মাসিমা, মাসিমার ননদ আর তাঁর স্বামী ছিলেন সঙ্গে অবিশ্যি। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি পুলকেশ আর রাগিণী পাহাড়ে উঠতে লাগল যে তাদের নাগাল পাওয়া ভার।

পাহাড়ের ওপরে একটি গুহা—নিচে অধিত্যকা। বড় নির্জন স্থান। সেই অধিত্যকার দিকে মাথা নিচু করে তাকাতে গিয়ে দুজনে পরস্পরের ঘন সন্নিবেশে সরে এল।

নিচের দিকে তাকাতে গিয়ে আমার মাথা ঘুরছে পুলকেশদা, শীগ্‌গীর ধরো আমাকে—না হলে এক্ষুণি পড়ে যাব।

পুলকেশের দৃঢ়বদ্ধ বাহুযুগলে ভীতা সন্ত্রস্তা রাগিণী সেদিন ধরা পড়েছিল।

আঃ, ছাড়ো ছাড়ো!

রাগিণীর এ কথায় পুলকেশ তাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল, কেন, তুমিই তো ধরতে বললে।

ধরতে বললাম, ভয় করছিল তাই। মাথা ঘুরে যাতে পড়ে না যাই।

এখন আর ভয় করছে না? মাথা ঘুরছে না তো!

রাগিণী জবাব দিল না। নিচে কী ভীষণ অন্ধকার দেখো। আমাকে টানছিল।

পুলকেশ রাগিণীকে বুকের কাছে আরো টেনে নিয়ে জিগ্যেস করল, এখন কে টানছে।

যাও, ভারি দুষ্টু তুমি!

পুলকেশের মনে তখন রঙ ধরেছে। রাগিণীর নিচু মুখখানিকে তুলে ধরে বলল, তোমাকে এমনি করে যদি চিরদিন বুকের মধ্যে রাখতে পারি রাগিণী, তা হলে—

তা হলে কী?!

তাহলে কোন অন্ধকারই আর তোমাকে গ্রাস করতে পারবে না।

রাগিণীর মনে তখন নবীন মেঘের রঙ।

নিচে থেকে হাঁক ডাক শোনা গেল। পুলকেশের বাবা আর মা চীৎকার করে ডাকছেন, নেমে এসো,—ওপরে আর উঠতে যেও না।

পাহাড়ের ওঠার সামর্থ্য তাঁদের নেই। মনে আশঙ্কাও আছে।

দু'টি যুবক-যুবতী পাহাড়ে উঠে চলেছে—যাদের আর দৃষ্টির সতর্কতায় পাহারা দেওয়া যাচ্ছে না। আর সম্পর্কও যাদের খুব নিকট আত্মীয়তায় বন্ধনে বাঁধা নয়। আগুন আর ঘী,—সুতরাং পরস্পরকে সরিয়ে রাখা দরকার।

শোভনা মাসির ভাবনা অন্য ধরনের,—দু'টোতে অত উঁচুতে উঠেছে, পা ফসকালেই বিপদ!

সেই রাত্রে ত্রিকূট থেকে ফিরে 'মধুস্মৃতি'র উত্তর দিকের ঘরে অতি সুখের ঘুম ঘুমিয়েছিল রাগিণী।

সমস্ত দিন পাহাড়ে ঘুরে ক্লান্ত শরীর আর মনের অতি উন্মাদনায় বড় আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। আর কী নরম বিছানা,—কী পরিচ্ছন্ন!

খোলা জানালা দিয়ে খানিকক্ষণ বাইরের দিকে আবেশ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল রাগিণী। রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত। কিন্তু

সেই অন্ধকারের মাঝে ত্রিকূট কোথায়? ঘন অন্ধকারের ছায়ায় ত্রিকূটের ধূসরতা ঢাকা পড়ে গেছে। দিগন্ত ঘেরা শুধু অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মাঝে আর সব কিছু যেন ডুবে যায়—শুধু ভেসে ওঠে ত্রিকূটের উপত্যকার নিচে সেই সুড়ঙ্গ,—সেই খদ।

রাগিণী আশ্চর্য হয়ে যায়,—ঘর মানুষজন ছাড়িয়ে শুধু অন্ধকার অধিত্যকা আব খদ তাকে এমন ভাবে নিম্নভূমির দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায় কেন?

অথচ ত্রিকূট পাহাড় থেকে নিচের অন্ধকার খদের দিকে তাকিয়ে যখন তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল তখন পুলকেশের বুকের মধ্যে থেকে তার দু'টি চোখের অভয় দৃষ্টির স্পর্শে সে নতুন এক আলোর সন্ধান পেয়েছিল। অন্ধকার নেই,—আলো শুধু আলো। রাশি রাশি আলোর অজস্র প্লাবন।

নরম পবিষ্কাব বিছানায় শুয়ে আব একবাব সেই আলোব স্পর্শানুভূতিকে পেতে চায় রাগিণী।

আশ্চর্য! যখন ঘুম থেকে জেগে উঠে চোখ মেলল তখন দেখল ঘরেব জানলা দিয়ে এক ঝলক আলো ছড়িয়ে পড়েছে 'মধুস্মৃতি'র উত্তরের ঘরে। মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে যে সূর্যালোক তাব সোনালী রঙ তার বিছানাকে পর্যন্ত ছুঁয়ে আছে।

ওঠ। আর কতক্ষণ ঘুমোবে?

তাইত! চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল রাগিণী।

বেলা কত হয়েছে বলো তো?

পুলকেশের কথায় আরো লজ্জা পেয়ে যায় রাগিণী।

কী ঘুমই না ঘুমতে পারো। চল, বেড়াতে যাবে না।

পুলকেশের ডাক সে শুনেছে। কিন্তু এমন নরম বিছানা আর আরামের ঘুম ছেড়ে কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে করছে না তার।

কী হল? আবার পাশ ফিরে শুলে যে?

ভারি আরাম লাগছে শুয়ে থাকতে।—পুলকেশের কথার উত্তরে রাগিণী বলল।

এখানে তবে কী দিন রাত শুধু শুয়ে থাকতেই এসেছ?

না তা নয়।

তবে?

যা নরম বিছানা। আর কী মিষ্টি ঘুম। বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

তা শুয়েই থাক তুমি।—পুলকেশের কণ্ঠস্বরে উত্তাপের সুর।

না, না, তা কেন?

তা হলে শীগ্‌গীর উঠে পড়। চলো, আজ নন্দন পাহাড়ে যাব।

কে কে?

তুমি আর আমি।

তুমি আর আমি? অদ্ভুত একটা সুরের তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে উঠল রাগিণীর মনে।

শুনছেন?

আবার কে ডাকে? রাগিণী তো দিব্যি আরামে শুয়ে আছে এখন। নরম তুলতুলে ডানলোপিলোর গদি-আঁটা শয্যা। বিছানার চাদর জুড়ে হরেক রঙের ফুল ছিটোনো। যেন সত্যিকারের ফুল। ফ্লাওয়ার ভাসে সাজানো জীবন্ত যে ফুলগুলি—তার সঙ্গে চমৎকার সৌসাদৃশ্য। কী সুন্দর মনোমুগ্ধকর শয্যা। কতদিন যে এমন বিছানায় শোয়নি রাগিণী!

শুনছেন? আরো চেঁচিয়ে ডাকল কাঞ্চন।

অবচেতনার মধ্যে নয়, স্পষ্টই রাগিণী শুনতে পেল কাঞ্চনের সম্ভাষণ। নিদ্রালু চোখ মুছে, তাকিয়ে দেখল সে। এ কী! অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! বম্‌পাস টাউনের 'মধুস্মৃতি'র সেই উত্তরের ঘর কই? কোথায় বা সেই ত্রিকূটের ধূসর রেখা।

আচ্ছা ঘুমোচ্ছেন যা হোক! একেবারে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।

তাই তো!—চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে রাগিণী।

বেলা কত হয়েছে জানেন?

কাঞ্চনের কথায় লজ্জিত হয়ে বাইবের দিকে তাকিয়ে দেখে রাগিণী,—হিমালয়ের পর্বত শিখর রঙে রঙে ভবে গেছে। দিগন্ত জুড়ে শুধু রঙ আব রঙেব মেলা। এত রঙ এলো কোত্থেকে? দু'চোখ ভবে রঙেব মায়া কাজল লাগল নাকি?

রাগিণী তবু উঠল না। উঠি উঠি কবেও কেমন যেন তার উঠতে ইচ্ছে কবছে না।

ও কা, আবাব পাশ ফিবে শুলেন যে।

কাঞ্চনেব কথায় এবাব সত্যিই লজ্জা পেযে গেল রাগিণী, বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। না?

সুন্দব প্রশ্ন আপনাব। কি রকম ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তা কী আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে? ঘড়িব দিকে তাকিয়ে দেখুন তো।

ইস্, তাই তো! অনেক বেলা হয় গেছে তো। এ কী, বিকেল পার হতে চলল। পাঁচটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। আমাকে ডাকেন নি কেন এতক্ষণ?

রাগিণীব কথায় হেসে ওঠে কাঞ্চন।—বাঃ, এ যে পাল্টা আক্রমণ দেখছি।

না, সত্যিই বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।

তার জন্যে কী আমি দায়ী?

দায়ী আপনাকে কে বলছে? আরো ঘণ্টা দেড়েক আগে তো আমাকে ডাকতে পাবতেন।

দেড় ঘণ্টা পরে ডেকেই যখন এই অবস্থা তখন দেড় ঘণ্টা আগে ডাকতে এলে না-জানি কী কুরুক্ষেত্রেরই না সৃষ্টি হত!

বেশ। তর্কে আর কাজ নেই। এত যে বলছেন,—আচ্ছা, আমার দোষটি কী বলুন তো। এত নরম ডানলোপিলোর গদি,—ঘুম আপনা থেকেই আর চোখ ছেড়ে যেতে চায় না।

আচ্ছা, উঠুন এখন। এরপর আপনার নরম বিছানা পাল্টে দেওয়াব ব্যবস্থা করছি। কিছু পাথরের নুড়ি বিছিয়ে দিতে বলি। কেমন ?

কাঞ্চনের এ বসিকতাব ঠিক অর্থ বোঝাবার মতন মন নেই তখন রাগিণীর। তার দু'চোখ জুড়ে ঘুম-ঘুম ভাব—নবম বিছানায় শুয়ে বমপাস টাউনেব মধুব স্বপ্ন।

সবিস্ময়ে তাই সে প্রশ্ন কবল, তাব মানে ?

তার মানে দুই আব দুইয়ে মিলে চাব।

হেঁয়ালি ছেড়ে সহজ সবল ভাষায় বলুন।

বাগিণীব কথায় কাঞ্চন বলল, এ কথাব মানে আব বুঝলেন না ? পাথবেব নুড়ি বিছানো থাকলে বিছানার কোমলতা আব থাকবে না। আপনাদেব কবিব ভাষায় যাকে বলা হয় বন্ধুর। এ শয্যা হবে বন্ধুর। আর তা হলে ঘুমও কমে যাবে।

এতও জানেন আপনি !—সত্যি, কথায় আপনার অনেক রঙ।

আব চোখে ?

চোখের রঙকে এখনো দেখতে পাইনি।— কথা ক'টি কাঞ্চনকে বলে ফেলেই রাগিণী লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল।

যাক্! কথাব আর চোখেব রঙকে ছেড়ে বাইরে প্রকৃতির বঙের দিকে এইবার তাকিয়ে দেখুন!

কাঞ্চনের কথায় বাইবের দিকে তাকিয়ে দেখল রাগিণী—সুপার্ব! অপূর্ব! আচ্ছা, এত রঙের মেলা কেন ?

কালিম্পং-এর সূর্যাস্ত। এ-রঙের আর তুলনা নেই। এ দৃশ্য আপনি অন্য কোথাও দেখতে পাবেন না। কিন্তু আর কথা না, উঠে পড়ুন এবার' চা খাওয়া এখনো হয়নি আমার।

সে কী! কেন ?

বারে, অতিথি সৎকার না করে আগে থেকেই ওপাট সারি কেমন করে ? কী ভাববেন তা হলে আপনি ?

এত অতিথি-প্রীতি আপনার ?

এটা অবশ্যি শুধু আপনার প্রতিই নয়। এ অতিথি-প্রীতি, অতিথি সেবা আমাদেব ভারতেব সনাতন আদর্শ। আমি সেই ট্র্যাডিসনকেই বয়ে চলেছি মাত্র।

ছি-ছি। না, ভারি লজ্জার ব্যাপাব। খুব অন্যায় কাজ করছেন আমাকে না ডেকে। চলুন, এক্ষুণি যাচ্ছি চায়ের টেবিলে। মাত্র পাঁচ মিনিট লাগবে আমাব।

মুখের কথায় পাঁচ মিনিট। হিসেবেব ঘড়িতে দেখা গেল আবো পঁচিশ মিনিট লাগল বাগিণীব।

বমপাস টাউন থেকে কালিম্পং—অনেক পথেব ব্যবধান। কালেবও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে বৈ কি ?

মাসির আদুবে মেয়ে তখন রাগিণী। জীবনে অভাব বলতে প্রকৃতপক্ষে কিছু ছিল না। সতের বছরের অনূঢ়া বর্ণাঢ্যা তরুণী। চোখে তখন স্বপ্ন, মনে রঙ। সেদিনের স্মৃতিতে ভবপুব হয়ে ছিল তার অন্তব। হাল্কা হাওয়ায় খানিকটা ভেসে ভেসে বেড়ানো আর কি।

সতের বছব থেকে আরো আট বছর কেটে গেছে। ফাস্ট ইয়ারের আর্টসের ছাত্রী ফোর্থ ইয়ারে এসে একবার ঠেকে গেল। বি-এ ফেল করতে খুবই বেদনা পেলেন মাসি; কিন্তু পবেব বছরে বি-এ পাশ করায় সে বেদনার ক্ষতচিহ্ন মুছে গেল। কী আনন্দ মাসির! পাস কোর্সে পাশ, তাতে কী হয়েছে। অনার্স না থাকলেও তো য়্যুনিভারসিটিতে এম-এ পড়া যায়। কিন্তু,—জীবনে তা আব হল কই ? হঠাৎ মেসোমশায়ের মতনই মাসিও পরলোকগমন করলেন বিনা নোটিশে। তারপর বাস্তবের ধূলিধূসরিত রাজপথের জীবন। এখন আর কল-কাকলি নেই,—পরিপূর্ণ কলরবের জীবন। জন-প্রবাহের তরঙ্গ, জনসমুদ্রের কল্লোল,—মিছিলের কলরোল। এখন

আর সময় কই রাগিণীর সূক্ষ্ম সুরের কলতান তোলার? জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত শুধু হিসেব মাফিক কাজ করা, মেপে মেপে কথা বলা, সতর্কিত পথচলা।

হিসেবের বাইরে হঠাৎ আবার চলে এসেছে রাগিণী। শহরের জনতা এখানে নেই, নেই জীবনের বাঁধাধরা রুটিন। মেঘ আর রঙ হিমালয়ের নৈসর্গিক পরিবেশ আজ তার মনকে আবার উন্মনা করে তুলছে।

পঁচিশ বছরের রঙচটা জীবন থেকে আবার সে ফিরে গেছে সেই সতের বছরের বর্ণ-সুষমামণ্ডিত দিনগুলিতে। কালিম্পং থেকে দেও-ঘরের বমপাস টাউনের 'মধুস্মৃতি' ভবন তাই এত কাছাকাছি।

বাথরুমে ঢুকে ভালো করে মুখখানিকে পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে রঙিন দেওয়ালে ফিট করা লুকিং গ্লাসের দিকে তাকিয়ে দেখে রাগিণী—চোখের কালিমাটুকু এখন ঢাকা পড়ে গেছে। দিবানিদ্রার আমেজ তখনো চোখে মুখে জেগে রয়েছে। ফোলা ফোলা চোখ-মুখ যেন ভালোই দেখতে লাগছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সাজতে লাগল রাগিণী।

সস্তা দামের টয়লেট,—তবুও অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে তাই দিয়েই প্রসাধন করল সে। চোখ দু'টিতে সূক্ষ্ম রেখায় সুর্মা টেনে দিল। মুখে ক্রিমের প্রলেপ লাগিয়ে তার ওপর স্নো ঘষে ঘষে মুখখানিকে পরিষ্কার করে ফেলল। তারপর গোলাপী রঙের ফেস পাউডার লাগিয়ে ব্রাশ টানতে লাগল।

এইবার পরিচ্ছদ সজ্জার পালা।

বেশি শাড়ি সে সঙ্গে আনেনি। সাধারণ ব্যবহার্য মাত্র কয়েকখানি শাড়ি। আর সঙ্গে আছে মাসিমার দেওয়া একখানি আকাশী রঙের বিলিতি জর্জেট। এই রঙটিতে নাকি ভারি মানায় তাকে। বিশেষ করে পুলকেশের দৃষ্টিতে। তার শ্যামলী চেহারায় আকাশী নীল রঙ সুন্দর ম্যাচ করে,—তার সঙ্গে গায়ে লাল রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ।

পুলকেশ ওই বেশে তাকে দেখতে বড় ভালোবাসত। বিশেষ করে নীল জর্জেট শাড়িটি সবচেয়ে পছন্দ ছিল তার,—কী সুন্দর রঙ তোমার শাড়িখানির। এত সুন্দর মানায় তোমাকে।

উত্তরে রাগিণী বলেছিল, ও তোমার চোখের রঙ।

শুধু চোখের রঙ কেন। বলো, মনেরও রঙ।

শাড়িখানি সত্যিই সুন্দর। মাসিমার সঙ্গে গিয়ে নিউ মার্কেট থেকে নিজে পছন্দ করে কিনেছিল সে।

আজকের বেশভূষায় গায়ে পরবার জন্যে রাগিণী আর লাল রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ পরল না। বরঞ্চ কমলা নেবু রঙের উজ্জ্বল ব্যাঙ্গালোর সিল্কের ব্লাউজটিই ভালো—এটি সে সম্প্রতি কিনেছে। বেশ জ্বল জ্বল করছে রঙটি।

ব্লাউজটি গায়ে দিল রাগিণী। কিন্তু শাড়ির ব্যাপারে খানিকটা ভাবতে হল তাকে। আকাশী রঙের সেই পুরানো জর্জেট—না, অন্য কিছু। সাধারণ তাঁতের সঙ্গে আর এক আধখানা সিল্কের শাড়িও সে এনেছে। দামী অবিশ্যি নয়,—তা হলেও মুর্শিদাবাদী ধোয়াটে পাতা রঙের শাড়িটিকে খুব খেলো বলা চলে না। এ বাড়ির উপযুক্ত নয়,—সে তো আর জানত না যে এমন একটা যোগাযোগ ঘটবে। তা হলে না হয় আরো দু'চারখানি দামী শাড়ি আনা চলত।

আকাশী রঙের জর্জেট শাড়িটাই যদি এখন সে পরে। আটবছর পরে আকাশী নীল রঙকেই যদি সে আরেকবার স্পর্শ করে,—তা হলেই বা মন্দ কী! মন আজ তার এই রঙকেই তো ছুঁতে চায়।

আট বছর আগেকার পাট করা শাড়িখানিকে অকারণেই রাগিণী সঙ্গে করে এনেছে। কে জানত,—এমন দিনে এই শাড়িখানির কথাই তার মনে পড়বে।

সুটকেস খুলে রাগিণী সেই শাড়িখানিকেই বের করল। ভাঁজে ভাঁজে তার ন্যাপথলিন দেওয়া। বহু যত্ন করে সে এটিকে রেখে দিয়েছে। মাসিমার স্মৃতি আর পুলকেশের স্পর্শমাখা।

কিন্তু কী বিশ্রী গন্ধ ন্যাপথলিনের। খানিকটা সেন্ট ঢেলে দিল সে শাড়িখানিতে। তবুও গন্ধ যেন যায় না।

তা না যাক, শাড়িখানির স্থানে স্থানে রঙ চটে গেছে। উজ্জ্বল নীলকাশের রঙ আট বছর পরে এখন কিছুটা বিবর্ণও বুঝি বা। শাড়িটির সব জায়গাতে রঙের সমতাও নেই আর এখন।

না, এটা এখানে আব না পরাই ভালো। তার চেয়ে বরঞ্চ মুর্শিদাবাদখানাই পরা যাক্! তবু ইজ্জৎ থাকে।

আকাশী বঙেব শাড়ি আর তার নেই। ধূসর ধোঁয়াটে রঙের মুর্শিদাবাদ শাড়ি। রাগিণী ভাবে,—তাই বা মন্দ কী? এ রঙটাতেও তাকে নাকি মানায় ভালো। অন্তত তার অফিসের সহকর্মীদের চোখে।

যেদিন শাড়িটি প্রথম পবে অফিসে গিয়েছিল সেদিন অনেকের অনেক মন্তব্য ধ্বনি তার কানে এসেছিল, –মিস্ চ্যাটার্জীর আজ বোধ হয় পাকা দেখা। –রসিকতা প্রকাশ করেছিলেন আধবুড়ো রেকর্ডকীপার।

না, শাড়িটা বোধ হয় জন্মদিনে ওঁর কোন মেল ফ্রেণ্ডের কাছ থেকে উপহার পাওয়া।—বলেছিল ডাকবাবু।

ডাকবাবু অর্থাৎ ডেসপ্যাচারের তবু অন্তর্দৃষ্টি আছে। এই শাড়িখানি রাগিণীর খুব পছন্দমাফিক। আর সত্যিই,—এটা তার জন্মদিনে শিশির তাকে উপহার দিয়েছিল।

রিয়্যালি সুন্দর দেখাচ্ছে মিস্ চ্যাটার্জিকে। ধোঁয়াটে রঙে এত সুন্দর ম্যাচ করেছে!—প্রশংসাবাদ জানিয়েছিল তরুণ টাইপিস্ট।

ধোঁয়াটে রঙেব প্লেন মুর্শিদাবাদে তার শ্যামলাঙ্গ মানায় ;মন্দ নয়—গায়ের ওপর শাড়িখানি মেলে ধরে সামনের ড্রেসিং টেবিলের গ্লাসেব দিকে তাকিয়ে দেখে রাগিণী।

তবু মন ভরে না। বড্ড ধূসর রূপ। কলকাতার রাস্তায় ট্রামে, বাসে রঙটি মানানসই। ঘরের মধ্যেও বেশ দেখায়। ঘরের বাইরে

কালিম্পং-এর পাহাড়ের মাথায় অজস্র রঙের বাহার যেখানে,— সেখানে এ রঙটি যেন বড্ড বেমানান।

কাচের জানলা দিয়ে বহিঃপ্রকৃতির দিকে তাকিয়ে রাগিণীর অন্তত তাই মনে হল এখন।

ধূসর রঙের মুর্শিদাবাদ শাড়িটি পাল্‌টে নিয়ে শোভনা মাসির দেওয়া নীল জর্জেটটাই পরল সে। নীলরঙের সেই পূর্বেকার জৌলুষ না থাকলেও মন্দ দেখাচ্ছে না তাকে। ফিকে নীলের নীলাভ বর্ণে আকাশের সুনীল রঙের কিছুটা আভাস পাওয়া যায় তবু।—না,—এই শাড়িটিই ভালো।

বদ্ধ ঘরের কপাট বন্ধ। রাগিণীর সাজ আর হয় না। শাড়ি নিয়েই যত ভাবনা তার।

বাইরে থেকে কাঞ্চনের গলা শোনা গেল,— পাঁচ থেকে আরো পঁচিশ মিনিট পার হয়ে গেছে কিন্তু মিস্ চ্যাটার্জী।

রাগিণী লজ্জিত হয়ে উঠল,—এই যে, যাচ্ছি। হয়ে গেছে আমার।

এবার খুব তাড়াতাড়ি শাড়িটিকে পরে ফেলল রাগিণী। ধূসর মুর্শিদাবাদ শাড়িখানি ফের পাট করে তুলে রাখতে আরেকটু সময়ের শুধু দরকার।

চা না খেতে পেয়ে মাথা ধরে যাচ্ছে—কাঞ্চন আবার তাগিদ দিল।

ওঃ, কী যে স্বভাবের মানুষ। মেয়েদের সাজ-গোজের ব্যাপার-স্যাপার একটু যদি বোঝে। কিন্তু মনে মনে বললেও মুখে ফুটে এ-কথা প্রকাশ করা যায় না তা বলে।

খুট করে বন্ধ দরজার খিল খুলে ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে এল রাগিণী।

দেহ সজ্জায় এমন কিছু চাকচিক্য নেই, অসাধারণত্ব তো একে-

বারেই নেই। তবু তার দিকে কাঞ্চন খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখল,—সত্যিই মন্দ দেখাচ্ছে না রাগিণীকে।

তার দিকে কাঞ্চনকে অমন ভাবে তাকিয়ে দেখতে দেখে লজ্জিত কণ্ঠে রাগিণী বলল, চলুন, চলুন চায়ের টেবিলে যাওয়া যাক। ছি-ছি, মিছিমিছি দেরি হয়ে গেল। আর তা শুধু আপনার জন্যেই।

রাগিণীর কথা শুনে কাঞ্চনের গলায় বিস্ময়ের সুর ফুটে উঠল, আমার জন্যে?

হ্যাঁ। আপনার জন্যেই। ঘণ্টা খানেক আগে ডেকে দিলে এত দেরি তো আর হত না।

কাঞ্চন আর রাগিণী। দু'জনে গিয়ে চায়ের টেবিলে বসল পাশা-পাশি। পাহাড়ী পাচক চা আর কিছু খাবার সাজিয়ে রেখে দিয়েছে।

টিপট থেকে সুদৃশ্য পেয়ালায় চা ঢালতে যাচ্ছিল কাঞ্চন। রাগিণী বাধা দিল,—এটা মেয়েদের কাজ।

কাঞ্চন আপত্তি করল না।

পাশাপাশি দুটি চেয়ারের সামনে চায়ের টেবিল। দু' পেয়ালা চা ঢেলে দুধ চিনি মিশিয়ে দিয়ে একটি চায়ের কাপে চুমুক দিল রাগিণী।

এ কী শুধু চা খাচ্ছেন!

অনেক বেলায় খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। এখন শুধু চা ছাড়া আর কিছু খাওয়ার ইচ্ছে নেই।

চায়ের কাপে দ্বিতীয়বার চুমুক দিয়ে রাগিণী জিগ্যেস করল কাঞ্চনকে, বৌদি কোথায়?

তিনি বেরিয়েছেন তপোবনে।

তপোবন!

দেওঘরের তপোবন ঝলমলিয়ে ওঠে রাগিণীর চোখের সামনে। জিগ্যেস করল, তপোবন আবার কোথায় এখানে?

এই কাছেই। বৌদির এক বান্ধবীর বাড়ি।

তপোবন তা হলে বাড়ির নাম?

হ্যাঁ। গার্হস্থ্যাশ্রম। সাধনপীঠ নয়।

দু'জনেই একথায় এক সঙ্গে হেসে উঠল।

পাঁচ

ছোট্ট পাহাড়ী শহর কালিম্পং।

এ শহর ঘুরে ফিরে দেখতে কতক্ষণই বা আর সময় লাগে। পথের কোনো বৈচিত্র্য বিশেষ নেই। উঁচু নিচু পাহাড়ী পথ,—কোথাও উঠেছে আর কোথাও বা নেমেছে। কিন্তু তার থেকেও মনোরম নির্জনতা,—কমলালেবুর ফল, আর ফুলের বাসর। সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার আর ঝিল্লির সুর ছন্দ।

কাঞ্চন মিশুকে লোক। কথা ছাড়া সে থাকতে পার না। কথা বলার আর্ট তার ভালো। প্রকৃতির প্রতি অনুরাগও তার আছে, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার লোক সে। প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কথার উচ্ছ্বাসের মালা সাজিয়ে কাব্যসৌরভ ছড়াতে সে তেমন সুপটু নয়। প্রকৃতির দৃশ্য নিয়ে তন্ময়তার ভাব তার নেই। কিছুটা উচ্ছ্বাস প্রবণ; কিন্তু ভাবের গভীরতা তার চরিত্রে নেই। আর সেই জন্যেই ভাব-গম্ভীর্যকেও সে সহ্য করতে পারে না।

রাগিণী আবার তার ঠিক বিপরীতধর্মী।

উচ্ছ্বাস তার মনেও প্রবল, কিন্তু সে উচ্ছ্বাস প্রকাশে একটা সংযমের ভাব। আবেগের বন্যায় ভেসে চলার উচ্ছলতা তার মধ্যে নেই। প্রকৃতির রোমাঞ্চে মন তার আপ্লুত হয় বটে। কিন্তু আগেকার মতন চঞ্চল কিশোরী যুবতী এখন আর নয় সে। এখন লিরিকের তত্ত্ব এবং তথ্য খুঁজে দেখার প্রয়াসী। বয়েস হয়েছে তার। কল্পনা নিয়েই জীবন কাটানোর অবকাশ নেই আর। এত যত্নের উদ্যমের এত সাহসের শৈল পরিক্রমায় তাই নিছক খানিকটা রোমাঞ্চ কুড়োতেই মন তার আগ্রহী নয় আর। কলকাতা শহরের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের গ্লানির

বাইরে এসে রূপ রঙে ভরা শৈল প্রদেশে জীবনকে খানিকটা সৌন্দর্য এবং নন্দনতত্ত্বে ভরিয়ে তুলতে পারলে দেশ বেড়ানো ও দেশ দেখা সার্থক হবে।

কাঞ্চনের আর কী?

বড়লোকের ছেলে,—নিজেও সুবিত্তের অধিকারী। হিমালয়ের এই নৈসর্গিক শোভা-সৌন্দর্য এ তো তার নিত্য পাওয়া। এর জন্যে চাওয়ার কোনো তাগিদ নেই। তার চেয়ে বরঞ্চ নব্য সঙ্গিনীর সঙ্গ-লাভই এখন তার ভালো লাগছে বেশি।

রূপ সব সময়ে দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। দেহাতীত রূপও আছে। সৌন্দর্য অনেক ক্ষেত্রে মানসিকাতায় পরিব্যপ্ত। মানসিক রূপ দৈহিক রূপকে পরাজিত করে নিজস্ব সত্তাকে যখন ফুটিয়ে তোলে তখন তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক ধর্ম এবং সেই রূপকে তারিফ করা বুদ্ধিজাত। রুচির ক্ষেত্রে এই রূপের দাম আলাদা।

এই রূপের অধিকারিণী—রাগিণী। তার দেহের সৌন্দর্য নগণ্য; কিন্তু চলা-ফেরায়, আলাপ-আলোচনায়, মানসিক বুদ্ধিতে তার মতন একটি স্মার্ট মেয়ে যে সহজেই পুরুষের চিত্ত জয় করতে পারে মাত্র একটি বেলার সাহচর্যেই—কাঞ্চন তা অনুভব করেছে।

শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং। এ-পথে কাঞ্চনের কত না আশা-যাওয়া। বৌদির কাজিন তপতীকে নিয়েও কম পক্ষে সে বার দশেক আসা-যাওয়া করেছে। কিন্তু রাগিণীর সঙ্গ-মাধুর্য যত মধুর ততখানি মাধুর্যকে সে এর আগে উপভোগ করতে পারে নি। কথার পিঠে এমন কথার বিন্যাস কোথায় তপতীর মধ্যে?

তপতীর দেহের উষ্ণতা,—সে তো অনেক পাহাড়ী-কামিনকেও গাড়িতে পাশে বসিয়ে চলতে চলতে অনুভব করা যায়। কী উষ্ণতা তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে। কী উত্তেজনা তাদের যৌবন পুষ্ট দেহের স্পর্শ লাভে। কিন্তু কথা বলা চলে না তাদের সঙ্গে। ভাবের কোন

বিনিময় ঘটে না তাদের সাহচর্যে। রোমাঞ্চেরও কোন আমেজ নেই তাদের মধ্যে। শুধুমাত্র এক দৈহিক লালসার আকর্ষণ!

মনস্তত্ত্ববিদ বলবেন, মানসিকতার চরিতার্থতা এক্ষেত্রে আছে। দেহ আর মন—একেবারে আলাদা সংজ্ঞা নয়। অন্তত প্রেমের ক্ষেত্রে দেহকে বাদ দিয়ে শুধু মানসিক বিকাশই সব কিছু নয়।

দেহ আর মন,— এ দুটির পৃথক সত্তাকে অনুভব করেছে কাঞ্চন। বিশেষ করে রাগিণীর সাহচর্যে। দেহের আকর্ষণে জয় করতে পারেনি কাঞ্চনকে। কিন্তু মনের আকর্ষণে অনেক কাছে টেনেছে। তপতার সুশ্রী যৌবনবতী দেহ প্রলোভনের। পাশাপাশি তাকে নিয়ে মোটরে চলতে অনেক উষ্ণতাকে কাঞ্চন অবশ্যই অনুভব করছে;— কিন্তু তা শুধুমাত্র দেহগত। মনের গভীরতম কথা, হৃদয়ের নিবিড়তম ভাবের আদান প্রদানে সূক্ষ্মতার অভাব প্রতি ক্ষেত্রেই প্রকট হয়ে উঠেছে।

ড্রাইভার রামবাহাদুরের হাত থেকে মোটরের স্টিয়ারিং কেড়ে নিয়েছে কাঞ্চন। তপতীকে দেখিয়েছে তার গাড়ি চালানোর কলা-কৌশল।

বাঁকের মুখে গাড়ি ঘুরতেই তপতী ভয়ে শিউরে উঠেছে,— মাগো!

ফিক্ ফিক্ করে হেসে উঠেছে কাঞ্চন,—দুয়ো।

দুয়ো নয়। স্টিয়ারিং ছাড়ো তুমি। রামবাহাদুর চালাক।

কেন?

কেন আবার? এক্ষুণি এ্যাক্সিডেন্ট হত। গাড়ি খাদে পড়েছিল আর কী!

এত কাঁচা ড্রাইভার নই আমি।

না হয় পাকা ড্রাইভার বলেই স্বীকার করে নিলাম। কিন্তু বীরত্বে আর কাজ নেই।

কাঞ্চন কাব্য করার প্রয়াস করেছে তখন—

'Away, away from man and towns

To the wild wood and the downs'...

এ কথার কোন অর্থই বোঝে নি তপতী। শুধু বোকার মতন মোটা স্বরে সে বলেছে, অত কাব্য করার সখ আমার নেই বাপু। খাদে পড়লে রক্ষে ছিল নাকি? আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

তবু কাঞ্চন বলেছে, তা হলে আর কী রোমাঞ্চ হল?

মরে গিয়ে রোমাঞ্চ? অমন রোমাঞ্চ চুলোয় যাক্!

এরপব আর কোন কথা বলা চলে না। তাই পাশাপাশি বসে মোটর ড্রাইভিংকালে কোন কথাই বলে না আর কাঞ্চন তপতীর সঙ্গে।

রাগিণীর সঙ্গে কিন্তু অনেক কথাই চলে। কথা বলতে পারলেই সুখ। কথার মধ্যে সুর আসে। এইটুকখানি শহর পরিক্রমায় কত কথাই না কাঞ্চন বলতে লাগল রাগিণীকে।

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার তুটি পদ্ধতি মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হতে থাকে যেন—

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা তু'জন চলতি হাওয়ার পন্থী!

ডাক বাংলো পার হয়ে পাহাড়ী রাস্তা ক্রমশ উঁচুর দিকে প্রসারিত। হৈমন্তিক সন্ধ্যায় এরই মধ্যে সে-পথ নির্জন হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে তু'চারজন পাহাড়ী অধিবাসীর সাক্ষাৎ মিলছে। পাহাড় এখানে অপেক্ষাকৃত মৌন-গম্ভীর। অন্তহীন পাহাড়ের গায়ে শুধু বাঁকের সমারোহ। এখানে ওখানে ঝর্ণার কলতান।

সন্ধ্যার অন্ধকার ছাপিয়ে ফিকে জ্যোৎস্নার আলো ফুটে ওঠে আকাশের গায়ে। ওপরের টিলায় পাইনের সবুজ মাথায় চন্দ্রালোক। নিচের খাদে রহস্যময় অন্ধকার।

কেমন লাগছে আপনার?

কাঞ্চনের প্রশ্নের উত্তর রাগিণী বললে, চমৎকার!

তা হ'লে অপকার করিনি বলুন।

অপকার করবেন কেন?

দার্জিলিং যেতে না দিয়ে।

রাগিণী বললে, দার্জিলিং সম্পর্কে এমন কিছু মোহ নেই আমার।

কাঞ্চন জিগ্যেস করল, তা হলে যাচ্ছিলেন কেন?

হিমালয় দেখবার জন্যে।

দার্জিলিং-এ কিন্তু তিস্তাকে পেতেন না।

কাঞ্চনের কথায় রাগিণী হেসে বলল, তিস্তাকে না পেলেও অন্য কিছু পেতাম হয়ত।

হয়ত বলছেন কেন?

জীবনের অনেক পাওয়াই তো অনিশ্চিত।

কাঞ্চন এবার রহস্য করে বললে, কিন্তু কাঞ্চন লাভ অবশ্যই অনিশ্চিত ছিল।

বলেন কী।

ঠিকই বলেছি। দার্জিলিং-এ কাঞ্চনকে কোথায় পেতেন বলুন?

কাঞ্চন কী এমনই দুর্লভ?

শুধু দুর্লভ নয়। সুদুর্লভ।

বটে।

হ্যাঁ।

আপনার নিজের সম্বন্ধে তো দেখছি খুব উঁচু ধারনা।

আমার সম্বন্ধে নয়। বলছি কাঞ্চন-লাভ সম্পর্কে।

কথাটির বাঁকা অর্থ ধরল রাগিণী। উত্তরটাও তাই একটু তীক্ষ্ণ ধরণের হল,—কামিনীরা যদিও কাঞ্চন প্রিয়, তবু কিন্তু তার মধ্যে ব্যতিক্রমও আছে।

ব্যতিক্রম থাকতে পাবে। কিন্তু অতিক্রম! অতিক্রম করতে পেরেছেন কী?

পেরেছি বৈকি? পেরেছি বলেই তো এত সাহস। কিন্তু আর নয়। কথায় কথা বাড়ে। চলুন, এবার বাড়ি ফেরা যাক্!

কাঞ্চন পরিহাসের সুরে বললে, এত সাহসের কথা জোর গলায় প্রকাশ করলেন এই এক্ষুণি, আবার এরই মধ্যে পিছিয়ে যাচ্ছেন।

পিছিয়ে যাব কেন?

তবে যে ফিরতে চাচ্ছেন? নাইট ইজ টু ইয়ং নাও!

রাগিণীও যেন লড়াই করতে চায়—অপপ্রয়োগ করবেন না। নো—প্লিজ ডোণ্ট!

মানে?

এর মানে দুই আর দুইয়ে পাঁচ নয়। দুই আর দুইয়ে চারই।

বুঝলাম না।

প্রচণ্ড হাসি করল রাগিণী, এই বুদ্ধি নিয়ে কাঞ্চনের ঔজ্জ্বল্যকে প্রকাশ করছিলেন নগরে?

কাঞ্চনের হার হল। জিগ্যেস করল, অপপ্রয়োগ কোথায় হল বুঝিয়ে বলুন।

রাগিণী বলল, এত মধুর কাব্যের প্রয়োগ পাত্র বিশেষের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা কী উচিত নয়?

পাত্র-বিশেষ? না পাত্রী-বিশেষ?

কাঞ্চনের কথায় মৃদু হেসে রাগিণী বলল, ত্রুটি স্বীকার করে নিলাম ব্যাকরণ ভুল আর করব না। হ্যাঁ, পাত্রী-বিশেষই না হয় হল।

তাই বলুন!

কিন্তু না হলে অপপ্রয়োগ-দুষ্ট হলাম কেমন করে?

নরম গলায় রাগিণী বলল, আপনার নিজস্ব এই বিশেষণগুলো যাঁর পাওনা তাঁর প্রতি প্রয়োগই তো বিধেয়।

কাঞ্চন সকৌতুকে প্রশ্ন করল, তিনি আবার কে? কার কথা বলছেন?

শান্ত মুখে রাগিণী উত্তর দিল, যিনি আপনার বেটার হাফ হতে চলেছেন!

আর একটু পরিষ্কার করে বলুন।

কাঞ্চনের কথায় রাগিণী এবার সোজাসুজি বলে ফেললে, কার কথা বলছি তা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন। তবু যখন না বোঝার ভান করে আমার মুখ থেকেই শুনতে চ ইছেন তখন স্পষ্ট করেই বলি। শুনুন।

দ্যাটস্ গুড। বলুন।

তিনি? তিনি হচ্ছেন শ্রীমতী তপতী দেবী।

রাগিণীর কথায় উচ্চকিত কণ্ঠে হো হো করে হেসে উঠল কাঞ্চন। প্রাণ খোলা হাসিতে তখন তার কৌতুকোদ্ভাসিত মুখখানিকে নির্মল দেখাচ্ছিল।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে রইল রাগিণী। মন বললে, সত্যি কথাই বলেছে কাঞ্চন। দার্জিলিং গেলে এ রত্ন কোথায় পেত সে?

কী দেখছেন অমন করে?

কাঞ্চনের কথায় রাগিণী লজ্জা পেয়ে গেল। নিজেকে ঢাকতে গিয়ে সে প্রশ্ন করল কাঞ্চনকে, আচ্ছা, কলেজে প্রক্সি দেওয়ার অভ্যাস বুঝি বেশি ছিল আপনার।

মাথা নেড়ে কাঞ্চন বলল, না। কিন্তু আপনার একথার মানে ঠিক বুঝলাম না।

এই জ ে ই তো বলে পুরুষের বুদ্ধি।

রাগিণীর কথায় কাঞ্চন হেসে বলল, পুরুষের বুদ্ধি যে মেয়েদের বুদ্ধির কাছে হার মানে আপাত ক্ষেত্রে তা না হয় মেনে নিলাম। স্ত্রী-বুদ্ধিতেই ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে বলুন না।

রাগিণী বলল, তার আর দরকার নেই। বেশ খানিকটা হাঁটা হয়েছে। এবার ক্লান্তি জাগছে। চলুন ফেরা যাক্।

এরই মধ্যে কেন? সবে তো সন্ধ্যে। এক্ষুণি বাড়ি ফিরে কী

করবেন ? তার চেয়ে আসুন কাছাকাছি এই পার্কটায় খানিকক্ষণ বসা যাক্।

ডাকবাংলোর ওপরে টিলাপার্ক।

জন বিরল সেই পার্কে কিছুক্ষণ বসেছিল কাঞ্চন আর রাগিণী পাশাপাশি অত্যন্ত কাছাকাছি হয়ে। মাত্র একটি বেলার বন্ধুত্বে তারা পরস্পরকে চিনে ফেলেছে অনেক বেশি।

কাঞ্চনের অনুরোধে রাগিণী তার জীবনের ইতিহাস শোনাচ্ছিল। রাগিণীর জীবন-কথা শুনে কাঞ্চন শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পড়ল তার প্রতি। আন্তরিকতার সুরে সে বলল, আপনাদের মতন মেয়েদের সত্যিই শ্রদ্ধা করি আমি।

হঠাৎ শ্রদ্ধা নিবেদন কেন ?

এই কঠিন মাটির সঙ্গে যে সংগ্রাম করে নিজের পায়ে দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন রিয়্যালি তা এ্যাডমিরেবল। শ্রদ্ধা করব না আপনাকে ?

করুন, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু রাত কত হল সে খেয়াল আছে কী ?

কেন, আপনার ভালো লাগছে না ?

ভালো লাগবে না কেন ?

তা হলে ?

রাত্ত যে অনেক হল।

কী আর এমন রাত হয়েছে। হাতঘাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে কাঞ্চন।

রাগিণী জিগ্যেস করল, কটা বেজেছে ?

মাত্র পৌনে নটা।

রাত পৌনে নটা হওয়ার কথা শুনে রাগিণী চঞ্চল হয়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিল। কাঞ্চন তার হাত ধরে বসিয়ে দিল, এত ব্যস্ততা কিসের ?

রাগিণী বলল, এ তো আর কলকাতার রাত নয়।

কলকাতায় রাত কী অনেক বড়?

হ্যাঁ।

আমার তো মনে হয় বরঞ্চ ঠিক তার উল্টো।

কেন?

কলকাতায় সারাদিন খাটা-খাটনির পর তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হয়। পরের দিনের অফিসের ভাবনা ভাবতে হয়।

এখানে অন্য ভাবনা যে ভাবতে হচ্ছে।

কিসের ভাবনা।

কাঞ্চনের কথায় আমতা আমতা করে রাগিণী বলল, আপনার বৌদি হয়ত কী মনে করছেন।

কী আবার মনে করবেন?

এই উড়ে এসে জুড়ে বসা।

জুড়ে বসুন না কিছুদিন। সত্যি, টু বি ফ্র্যাঙ্ক, খুব ভালো লাগছে আপনাকে।

কাঞ্চনের কথায় রোমাঞ্চ জাগে রাগিণীর মনে। এমনি অন্তরঙ্গতার সুর কতদিন সে শোনেনি। কিন্তু এ-সুরের পরমায়ু কতক্ষণ? বড় লোকের ছেলের এ হয়ত খানিকটা মনের বিলাস। এমনি বিলাস তাকে নিয়ে পুলকেশও করছিল একদা।

কত উচ্ছ্বাস আর কত স্তুতিবাদ। কিন্তু বাস্তবে তার মূল্য কতটুকু? আজ কী একবারও পুলকেশ তার কথা আর ভাবে?

তবু তন্ময়তায় আবার ডুবে যায় রাগিণী। জীবন-সত্যে এই ক্ষণ-মাধুর্যকে নাই বা বিশ্লেষণ করে দেখল এখন। তার চেয়ে এই সময়-টুকুকেই কেন না ভরিয়ে তুলুক কাঞ্চনের সঙ্গ-মাধুর্যে।

কী ভাবছেন আবার!—রাগিণীর নীরব তন্ময়তাকে লক্ষ্য করে কাঞ্চন প্রশ্ন করল।

পুলকসিঞ্চিত কণ্ঠে রাগিণী উত্তর দিল, ভাবছি, ভাবছি এখানকার

পরিবেশ আর মধুর জীবনের কথা। রাগিণীর কণ্ঠে স্বতস্ফূর্ত ভাবেই উচ্চারিত হল—

My soul
Smoothed itself out—a long cramped scroll
Freshening and fluttering in the wind.
Past hopes already lay behind.
What need to strive with a life awry ?

প্রশংসামুখব কণ্ঠে কাঞ্চন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল, বাঃ, কী সুন্দর আবৃত্তি !

তাই নাকি। সত্যি ভালো লাগল আপনার ?

সত্যিই ভালো লাগল।

রাগিণী সকৌতুকে জিগ্যেস করল, তপতী দেবীর গানের চেয়েও ভালো ?

ফিকে জ্যোৎস্নায় কাঞ্চন রাগিণীর মুখখানির দিকে তাকিয়ে দেখল। বলল, হঠাৎ একথা বললেন কেন।

সহজ সরল কণ্ঠে রাগিণী জবাব দিল, এমনি নিছক পবিহাস মাত্র।

শুধু পরিহাস !

হ্যাঁ। শুধুই পরিহাস।

তবু আপনার এই পরিহাস-কৌতুকের জবাব দিচ্ছি। শুনুন। তপতী দেবীকে আমি পছন্দ করি। তার ভেতর সূক্ষ্মতা নেই অবিশ্যি, বাট—দেয়ার আর আদার চার্মস্।

কাঞ্চনের এ-কথায় হঠাৎ যেন চাবুকের আঘাত লাগল রাগিণীর মনে। ধরা গলায় আহত সুরে সে বলল, ডোণ্ট গো সো ফার। প্লিজ ডোণ্ট! সে প্রশ্ন আমি করিনি। আমাকে এত ছোট ভাবছেন কেন।

সহজ গলায় নিজের মনোভাবকে প্রকাশ করে কাঞ্চন বলল, আমি

তা ভাবি নি। আপনাকে ছোট কেন অনেক বড় আসনে বসিয়েছি। আপনি আমার বন্ধু।

মনের ঔৎসুক্যকে ব্যক্ত করল রাগিণী, আর তপতী দেবী?

তিনি অত্যন্ত ম্যাটার অফ ফ্যাক্টের মেয়ে। তবে খুব গোছানো আর বুদ্ধিমতী। সংসারের আদর্শ ঘরণী বা গৃহিণী হবার যোগ্য।

কেন তাঁর শিল্পানুরাগের কথাও তো শুনেছি। তিনিও তো এস্‌-থেটিক। রবীন্দ্রসঙ্গীতে পারদর্শিনী, সুন্দর সেতার বাজান। রেডিওতে নিয়মিত প্রোগ্রামও করেন।

আপনি তাঁর রেডিও প্রোগ্রাম শুনেছেন?

না। সে-সৌভাগ্য আমার হয় নি এখনো।

রাগিণীর কথায় কাঞ্চন হেসে বলল, সেটা তাঁর পোশাকী ফ্যাসন। আসল শিল্পীসত্তা নয়।

এটা হয়ত আপনার ইমপ্রেশন মাত্র। সব মেয়ে তো আর বাচন-কলা নিপুণা হয় না!

হ্যাঁ। আপনাদের মেয়েলি কথাতেই তো আছে বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। বড্ড ভালগার একস্‌প্রেসন হয়ে গেল না।

রাগিণী মৃদু হেসে বলল, আপনার দৃষ্টি হয়ত তপতী দেবীর হৃদয়ের গভীর তলদেশের সন্ধান পায় নি।

হয়ত নয়। আমার ইমপ্রেশন যথার্থই সত্যি।

কিন্তু এ-প্রসঙ্গ নিয়ে আর এগুতে চায় না তপতী এখন। হাতের রিস্টওয়াচের দিকে দৃষ্টি পড়তেই অতি মাত্রায় ব্যস্ত এবং বিচলিত হয়ে পড়ল সে, ইস্‌, রাত সাড়ে নটা হয়ে গেল। উঠুন, আর এক মিনিটও দেরি করা চলবে না। অনেক রাত হয়ে গেছে।

পার্কের বাইরে আসতে আসতে কাঞ্চন বলল, আনন্দের ক্ষণকে সময়ের এমন চুলচেরা হিসেব কষে ক্ষুণ্ন করতে নেই।

কিন্তু ম্যাটার অফ ফ্যাক্টকেও ভুলতে নেই ক্ষণ-আনন্দে অধীর হয়ে। বৌদি নিশ্চয়ই খুব ভাবছেন আমাদের জন্যে।

হ্যাঁ। হয়ত গিয়ে শুনবেন এতক্ষণে থানা-পুলিশে খবর দেওয়াও হয়ে গেছে। মিসিং স্কোয়ার্ডে নাম ধাম সব কিছু লিপিবদ্ধ করানোও হয়েছে। হালকা সুরেই কথাগুলি বললে কাঞ্চন।

মেয়েরা কিন্তু মেয়েদের মন বেশি বোঝে। ছটফট করছিলেন কাঞ্চনের বৌদি।

রাত অনেক হয়ে গেছে। এখনো কাঞ্চনের দেখা নেই। আর সঙ্গে রাগিণীও। কী এমন ঘনিষ্ঠতা দু'জনের যে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত পাহাড়ী পথে নির্জনে ঘুরতে হয়? এটা যেন বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি। এতটা ভালো না মীনাক্ষী দেবীর। তাঁদেরও বয়সকাল ছিল। এবং এখনো বয়স কাল যে একেবারে ফুরিয়ে গেছে তা নয়। যতই হোক্—কাঞ্চন পর পুরুষ। পর্দার বালাই তিনি নিজেও মানেন না। একেলে মেয়ে। মেয়ে পুরুষের মেলামেশার কদর্থ করবার মতন মনোবৃত্তি তাঁর নেই; কিন্তু এতটা কেন!

বিয়ের আগে মীনাক্ষী দেবীও কত ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। কলেজে না যেতে পারেন তিনি; তাই বলে ঘরের কোণে কুনো মেয়ে হয়ে ছিলেন না কোনদিনই।

আঠার বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে তাঁর কাঞ্চনের দাদা অঞ্জন রায়ের সঙ্গে। তার আগে কত ছেলেই না আসত তাঁদের বাড়িতে। আলাপ পরিচয়ও হত। সিনেমায়ও গিয়েছেন দু'একজনের সঙ্গে। ডায়মণ্ড হারবার, আউটরাম ঘাটের জেটিতেও বেড়ানো যে হয় নি, তা নয়। তাই বলে রাগিণীর মতন হ্যাংলাটে স্বভাব কী ছিল তাঁর।

সুস্মিতার বন্ধু! আচ্ছা, এসেছ যখন তখন দিন দুই থাকো। কিন্তু সভ্যতা এবং ভদ্রতা থাকবে না কেন? এসে পর্যন্তই মুখে খৈ ফুটছে! যেন কত কালের কত নিকট আত্মীয়।

কাঞ্চনেরও বাড়াবাড়ি ভাবটি বড্ড বেশি দৃষ্টিকটু। একি মেয়েঘেঁষা স্বভাব! সরকার মশাইয়ের পাশের ঘরটি মীনাক্ষী দেবী নির্বাচিত

করেছিলেন রাগিণীর থাকবার জন্যে। কাঞ্চনই যত গোল বাধিয়ে বসল। পশ্চিম কোণের ঘর তাঁর বোন তপতীর জন্যে নির্দিষ্ট, তপতী একা এলে ওই ঘরেই থাকতে ভালোবাসে। তপতীর ওপরও তাঁর রাগ হয়—এত অলস প্রকৃতির সে। ট্রেনের সময়টুকুর পর্যন্ত জ্ঞান থাকে না।

সাজতে বসলে পুরো দু'ঘণ্টা সময় চাই। সাজতে বসে নিশ্চয়ই ট্রেন ফেল করেছে।

রাগিণী সম্পর্কে এরই মধ্যে কিছুটা বিতৃষ্ণার ভাব এসেছে মীনাক্ষী দেবীর মনে। কলকাতা শহরের চাকরি করা মেয়ে,—লেখাপড়াও শিখেছে,—ছেলে ধরার কলা-কৌশল চোখে মুখে। কেমন ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলে।

রাত সাড়ে নটা বেজে গেলেও কাঞ্চন রাগিণীকে বাড়ি ফিরতে না দেখে এই সব কথা যখন ভাবছিলেন মীনাক্ষী তখনই ওরা দু'জনে বেড়িয়ে ফিরে ওঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

বৌদি, বড্ড দেরি করে ফেলেছি।—কাঞ্চন ক্রটি স্বীকার কবল।

আমার কিন্তু একটুও দোষ নেই বৌদি।—বারবার বলেছি বাড়ি ফেরার কথা, কিন্তু আপনার দেওরের কালিম্পং দেখানোর ঔৎসুক্য আর থামে না। কালিম্পং-এর মতন সুন্দর জায়গা আর এ-ভারতে কোথাও নাকি নেই।

ও যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর। বেশ লোক যাহোক আপনি! আমাকে কাঠগড়ায় ঠেলে দিয়ে দিব্যি নিজে সরে দাঁড়াচ্ছেন।—কৌতুক কণ্ঠে কাঞ্চন অভিযোগ প্রকাশ করল।

রাগিণী বললে, আমি কখন থেকে বলছি বাড়ি ফিরবার কথা। তা কী মিথ্যে?

না। তা মিথ্যে কে বলেছে?

তবে! এত রাত্তির পর্যন্ত কালিম্পং দেখার ঘটা বাড়ি শুদ্ধু লোককে ভাবিয়ে—বড্ড বাড়াবাড়ি নয় কী?—মীনাক্ষীর মনের কথাই

রাগিণী বলে ফেলল। ভারি চালাক মেয়ে। আর কী স্পষ্টবাদিতা!

বৌদির মুখের কাঠিন্য ভাবকে ভদ্রতার খাতিরে তাই মুছে ফেলতে হল।

মীনাক্ষী দেবী নরম গলায় বললেন, সে কী! বেড়াতেই তো আসা। আবার কখনো আসা হবে কিনা তারও তো নিশ্চয়তা কিছু নেই। তবে—

বৌদির কথা লুফে নিল কাঞ্চন, কেমন হয়েছে তো।

কী হল?

আপনার হার হয়ে গেল।

বৌদি মধ্যস্থতা করলেন, দু'জনের কথাই ঠিক। কিন্তু আর কথা কাটাকাটি নয়। চল, এবার খাবে চল।

বাইরে সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ শোনা গেল।

পোস্টম্যান হাঁকছে—টেলিগ্রাম।

এত রাত্রে টেলিগ্রাম! কোত্থেকে?

এক নিঃশ্বাসে তার-বার্তা পড়ে কাঞ্চন তা বৌদির হাতে দিয়ে বলল, দেখ, তোমার বোনের কাণ্ডকারখানা।

কী হল আবার?—উৎসুক কণ্ঠে বললেন মীনাক্ষী।

তুমি নিজেই পড়ে দেখ।

টেলিগ্রাম পাঠ করে মীনাক্ষীর গম্ভীর মুখে প্রসন্নতার রেখা ফুটে উঠল। পরম নিশ্চিন্ততা একদিকে, আর একদিকে আনন্দোচ্ছ্বাসের বিদ্যুৎচ্ছটা তাঁর চোখে মুখে প্রতিভাত হতে দেখা দিল। ভাদ্রের মেঘ গেল কেটে। মনের অসহ্য গুমোট ভাব আর নেই।

একেই বলে প্রাণের টান। কী মেয়ে বাবা!

বৌদির কথায় কাঞ্চন হেসে বলল, তোমারই তো বোন। কিন্তু বৃহস্পতিবারের বার বেলায় বেরুচ্ছেন যে বড়। এই তো লিখেছিলেন —শুক্রবার যাত্রা করবেন।

হ্যাঁ। তাই ত আগের টেলিগ্রামে জানিয়েছিল। তারপর মত পাল্টেছে আর কি। কিংবা তুমিই অস্থির হয়ে টেলিগ্রাম করেছ কিনা তাই বা কে জানে!—

ঠাট্টার সুরে মীনাক্ষী মন্তব্য প্রকাশ করলেন।

আমি?—আকাশ থেকে মাটিতে পড়ল কাঞ্চন।

বিশ্বাস কী? – বলেন মীনাক্ষী।

কখন আবার টেলিগ্রাম করলাম? আমি তো সারা দুপুরই বাড়িতে। তারপর-বিকেল, সন্ধ্যে রাগিণী দেবীর সঙ্গে।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল রাগিণা। তার উচ্ছল মনের প্রকৃতি বন্যা পাহাড়ী কন্যা তিস্তার মতনই এতক্ষণ তব তর করে বইছিল। দেরি করে বাড়ি ফেরার জন্যে যে অসন্তুষ্ট মূর্তি মীনাক্ষী দেবীর—তাও তাকে ততটা অপ্রতিভ করে তুলতে পারেনি। তাকেও সে মানিয়ে নিতে পেরেছিল। কিন্তু হঠাৎ ওই তার-বার্তা তাকে যেন অতি মাত্রায় শক্ দিয়েছে। ইলেক্‌ট্রিকের প্লাগের গহ্বরে হাত পড়ে গেলে তড়িতাহতের যে দগ্ধতার জ্বালা—সেই জ্বালায় সে মূর্চ্ছাহত হয়ে পড়েছিল। মুখে-চোখে বেদনার গ্লানি। জ্ঞান ফিরে পাবার মতন চেতনায় সে আবার জেগে উঠল। তার এই ভাবান্তর দেখে মীনাক্ষীই বা কি মনে করছেন? আর কাঞ্চন বা কী ভাবছে তার সম্পর্কে।

পাণ্ডুর মুখে জোর করে হাসির রেখা টেনে রাগিণী দেওরের কথার পিঠে কথা জুড়ে বলল, হ্যাঁ বৌদি, আমি জানি। শিলিগুড়ি স্টেশনেই সকাল বেলা উনি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন।

তাই নাকি?—বৌদি সোৎসাহে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

মিথ্যে কথা।—কাঞ্চন বললে, সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বৌদি।

মীনাক্ষী মিটি মিটি হাসছিলেন। মনের অন্ধকার তাঁর কেটে গেছে। কাঞ্চন সম্পর্কে এখন নিশ্চিন্ত তিনি। রাগিণীর দিকে দেখেও দেখছেন না আর।

রাগিণী আবার রসিকতা প্রকাশ করল, শুধু শিলিগুড়ি স্টেশনেই

নয়। এখান থেকেও আজ সন্ধ্যেবেলা কাঞ্চনবাবু আরেকদফা টেলি-গ্রাম করেছেন।

খুশির বন্যায় বৌদির মুখ চোখ ভেসে উঠল। বললেন, বুঝেছি। ডুবে ডুবে জল খাওয়া!

এইবার কাঞ্চন হেসে ফেলল, আচ্ছা বুদ্ধি দু'জনের।

রাগিণী বললে, কেন?

আরে কাল সকালেই তো শিয়ালদহে তপতী আসাম লিঙ্কে চেপেছে। তাহলে টেলিগ্রাম করলাম কোথায় তাকে?

কাঞ্চনের কথায় মীনাক্ষী মন্তব্য প্রকাশ করলেন, হাওয়ায় গো, হাওয়ায়। নাও, চল। আর দেরি নয়। এবার খেতে যাই।

আমি আর কিছু খাব না বৌদি। আপনারা খান।—রাগিণী বলল।

বিস্মিত হলেন মীনাক্ষী, খাবে না কেন?

একরাশ খাওয়া হয়েছে।

তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালেন মীনাক্ষী, কোথায়?

গুম্ফায়। আপনার দেওর অনেক খাইয়েছেন।

রাগিণীর কথায় মীনাক্ষী দেবীর প্রসন্ন মুখে আবার মেঘের উদয় হল। সত্যিই কাঞ্চন বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছে। অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে,—তাঁদের মতন উচ্চবিত্ত সমাজে যার কোন স্থান নেই, না আছে রূপ, না আছে উঁচু ঘরের বংশ পরিচয়, তাকে নিয়ে এতখানি নাচানাচি করা মীনাক্ষীর চোখে সত্যিই দৃশ্যকটু ঠেকে।

তুমিও কী খাবে না কাঞ্চন?—গম্ভীর মুখে তীর্যক চাউনি মেলে মীনাক্ষী দেওরের দিকে তাকালেন।

কেন খাব না? দু'টো স্যাণ্ডউইচ, গোটা দুই কেক্ আর এক কাপ কফি—এতেই কী রাতের খাওয়া হয়ে গেল নাকি? এত ছোট পেট আমার নয়।—হেসে কাঞ্চন জবাব দিল।

তাহলে তুমি খেয়ে নাও কাঞ্চন। কাল সকালে তো আবার

স্টেশন এ্যাটেণ্ড করতে হবে। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়গে।

মীনাক্ষী কাঞ্চনকে নিয়ে খেতে গেলেন। রাগিণী খানিকক্ষণ ইতস্তত করল। তারপর ডাইনিং স্পেসের পাশের বারান্দায় এসে বসল।

একটা কঠিন সমস্যায় পড়েছে সে।

কিছুক্ষণ পরেই মীনাক্ষী দেবী ফিরে এলেন রাগিণীর কাছে। সে তখনো নিজের ঘরে যায় নি। বারান্দার সোফায় গা এলিয়ে শুয়ে ছিল।

বাইরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় ফিকে চাঁদের আলো,—মেঘের রঙের সঙ্গে সে আলো মিশে গিয়ে এক মোহনীয় রূপ ধারণ করেছে। পাইনের মাথায় মাথায় বাতাসের মর্মর ধ্বনি—রাগিণী একদৃষ্টে বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে।

শুতে যাও নি এখনো? মীনাক্ষী দেবী পাশের চেয়ারটিতে বসে রাগিণীর কাঁধে হাত রাখলেন।

না বৌদি। দুপুরে আজ খুব ঘুমিয়েছি। ঘুম আসছে না তাই এখানে এসে বসেছি। সত্যিই খুব ভালো লাগছে এ জায়গাটা।

একটু ইতস্তত করছিলেন মীনাক্ষী,—কেমন করে কথাটি পাড়বেন।

রাগিণীর অনুমান সতর্ক। দৃষ্টি প্রখর। মীনাক্ষীর চোখের দিকে তাকিয়েই তাঁর বক্তব্যকে সে বুঝি বুঝে ফেলেছে। সে তার সঙ্কল্প স্থির করে নিল। বলল, একটা কথা বলব বৌদি?

মীনাক্ষী তার দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, আমিও একটা কথা বলব ভাবছিলাম ভাই, কিছু যদি মনে না কর।

রাগিণী বলল, সে কথার আর দরকার নেই বৌদি। তার আগে বরঞ্চ আমার কথাটিই আগে বলে ফেলি।

বেশ বলো।

কাল সকালেই আমি যাব।

কোথায়?

কলকাতায়।

এত তাড়াতাড়ি।

হ্যাঁ।

দার্জিলিঙ যাবে না?

না।

এতদূরে যখন এলে, দার্জিলিঙটা দেখে গেলেই পারতে।—মীনাক্ষীর কণ্ঠে এখন সহজ সারল্যের সুর।

রাগিণী বলল, এবার দার্জিলিঙ ঘুরে গেলে আর কখনো আপনাদের বাড়ি আসা ঘটবে না।

কেন?

একবার দার্জিলিঙ দেখা হয়ে গেলে চোখে কী আর রং থাকবে বৌদি? না। দার্জিলিঙ দেখার জন্য আর আগ্রহ থাকবে না।

একবার কেন? কত লোক তো কতবারই দার্জিলিঙ ছাখে। তাদের আগ্রহ কী ফুরিয়ে যায় তা বলে? তাদের চোখে নতুন করে আবার তখন রং লাগে।—কথা ক'টি বলে মীনাক্ষী ফিকে হাসি হাসলেন। রাগিণীর কাঁধ থেকে হাতখানিও সরিয়ে নিলেন।

ভাগ্যিস সরিয়ে নিলেন। রাগিণীর শরীরে কাঁপন ধরেছে। অনায়াসেই মীনাক্ষী বুঝতে পারতেন কিসের স্পন্দন তার দেহের কাঁপুনির মধ্যে।

তবুও রাগিণী নিজেকে সংযত করেই রাখে। স্পষ্ট করেই মীনাক্ষীর কথার জবাবে সে বলল, বৌদি, জানেন তো কেরানিগিরি করে অর্থ-উপার্জন। একটা সংসারের দায়-দায়িত্ব মাথায়। এই কষ্ট করে জমানো টাকা খরচ করতে কত সতর্ক হতে হয় আমাকে।

ও, বুঝেছি। আচ্ছা। দার্জিলিঙ দেখার আহ্বান এরপর আমি যদি নিজে করি, এ-বাড়িতে আসার নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাই, আর যদি তার

সব খরচ আমি তোমায় দিই,—আশা করি বৌদির সে আমন্ত্রণকে তুমি উপেক্ষা করবে না।—সহজ সরল কণ্ঠে মীনাক্ষী বললেন।

রাগিণী উত্তর দিল,—নিশ্চয়ই আপনার আমন্ত্রণে সাড়া দেব। আর আপনার স্নেহের দানকে সসম্ভ্রমে মাথায় তুলে নেব। কিন্তু বৌদি—

এর মধ্যে আবার কিন্তু কী?

আপনার দেওর হয়ত খুশী হবেন না তখন।—খোঁচাটুকু আপনা থেকেই রাগিণীর কণ্ঠ থেকে বের হয়ে এল।

মীনাক্ষী কিন্তু তাতে কর্ণপাত করলেন না। ভারি সুখী তিনি। এত সহজে সে কাজ হাসিল হয়ে যাবে তা তিনি কল্পনাতেও আনতে পারেন নি। গলায় একটা মাছের কাঁটা যেন বিঁধেছিল—সে কাঁটা বের হয়ে গেল।

এবার তিনি প্রসঙ্গের মোড় ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, আচ্ছা, ঘরে যাও। রাত্তির হয়ে গেছে। শুয়ে পড়গে, ঘুম আপনিই এসে যাবে। কালকের যাওয়ার ভাবনা কাল সকালে করা যাবে।

মীনাক্ষী উঠে পড়েছিলেন।

রাগিণীই ডাকল, বৌদি।

মীনাক্ষী পিছন ফিরে দাঁড়ালেন, কী আবার?

একটা কথা।

বলো।

আমাকে যে সম্মান, যে-স্নেহ দেখালেন, যে-ভাবে আদর-যত্ন করলেন আমার তা চিরকাল মনে থাকবে। আপনাকে কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব তার যোগ্য ভাষা খুঁজে পাচ্ছি নে।

রাগিণী হাসলেন, কষ্ট করে আর তোমাকে তা খুঁজে দেখার দরকার নেই।

অজ্ঞতকুলশীল, উড়ে এসে জুড়ে বসা বৈ ত নয়, কিন্তু—

রাগিণীর কথা শেষ না হতেই মীনাক্ষী বললেন, তা কেন! তুমি আমার ননদের বন্ধু। অজ্ঞাতকুলশীল হতে হতে যাবে কেন ভাই।

আমাদের কাছ থেকে যেটুকু পেয়েছ তা তোমার অধিকার সূত্রেই পাওয়া।

রাগিনী মীনাক্ষীর হাত দু'টি চেপে ধরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, সত্যি কথাই বলেছি বৌদি। আপনাদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেলাম তা চিরকাল আমার স্মরণে থাকবে।

রাগিণী সোফায় বসেছিল। এইবার উঠে দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে মীনাক্ষীর পায়ের ধুলো মাথায় নিল।

তার মাথায় হাত রেখে মীনাক্ষী সস্নেহে বললেন, তোমার শিক্ষাকে সম্মান করবার সুযোগ দিলে ভাই। আশীর্বাদ করি, তুমি সুখী হও। মীনাক্ষী চলে গেলেন॥

রাগিণীও নিশ্চিন্ত। মস্ত বড় অপমানের হাত থেকে আজ সে উদ্ধার পেয়েছে।

মনে মনে সে তার সংকল্পকে দৃঢ় করে নিল।

ছয়

সারারাত ঘুম হল না রাগিণীর।

শীতের আমেজটা যদিও বেশ লাগছে আব সুকোমল শয্যায় শুয়ে নরম তুলোর লেপটি যদিও খুব আরামদায়ক বলে মনে হচ্ছে, তবুও চোখ দু'টিতে ঘুম তার কিছুতেই আসে না।

বিনিদ্র রজনীর মাঝে রাগিণী ছটফট করতে থাকে। এ-পাশ ওপাশ ফিরে কতবারই না সে ঘুমোবার চেষ্টা করল কিন্তু নিষ্ফল আশা।

কাঞ্চনের সান্নিধ্য তাকে নেশায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার আত্ম-সংযম, দৃঢ়তা আর বুঝি অটুট থাকে না। নিজেকে সে আর এখন শক্ত করে ধরে রাখতে পারছে না। কাঞ্চনের বৌদির চোখে তাই সে ধরা পড়ে গেছে। মীনাক্ষী দেবী তাই চান যাতে সে এখান থেকে চলে যায়।

মেয়েরা মেয়েদের সহ্য করতে পারে না, কাঞ্চনের তার প্রতি অনু-রাগ এবং তার এই উড়ে এসে জুড়ে বসাকে মীনাক্ষী দেবী সহ্য করবেন

কেমন করে? তার ওপর তাঁর স্বার্থও আছে। তপতী তাঁর বোন। আর তপতীর সঙ্গে কাঞ্চনের বিয়ে এক রকম স্থিরই হয়ে গেছে।

রাগিণীর ছায়া এ-ক্ষেত্রে রাহু। রাহুর মতনই কাঞ্চনকে রাগিণী গ্রাস করেছে। মেয়ে হয়ে অন্তত সে বোঝে তাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করা মীনাক্ষীর পক্ষে কত অস্বাভাবিক ব্যাপার। রাগিণী তো শুধু দু'দিনের অতিথি নয়, কিংবা ননদ সুস্মিতার বন্ধুমাত্রও নয়। কাঞ্চনের অন্তরে সে এখন স্থান পেয়েছে,—মীনাক্ষী তাকে সহ্য করেন কেমন করে?

ঠিক এমনটিই ঘটেছিল বমপাস টাউনের 'মধুস্মৃতি' ভবনে।

মাসিমার ননদেরও মুখ কালো হয়ে উঠেছিল পুলকেশের সঙ্গে রাগিণীর এমনি ঘনিষ্ঠতায়। দু'জনে অনেক রাত পর্যন্ত বেড়িয়ে বাড়ি ফেরা, সারাদিন একান্তে বসে ফিস্‌ফিসানি—অসহ্য লেগেছিল পুলকেশের মা বিনোদিনী দেবীর।

কী এত কথা দু'জনের মধ্যে?—আর তা আবিষ্কার করতে তিনি মেতে উঠলেন। রাগিণীর প্রতি তাঁর যে স্নেহ তা অন্তর্হিত হল। রীতিমত ঈর্ষ্যার ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন তিনি।

অবশেষে একদিন রাগিণীকে ডেকে নিজের মনোভাব স্পষ্টাস্পষ্টি বলেই ফেললেন, দেখ বাপু, তুমি এখন আর কচি খুকিটি নও। পুলকেশেরও বয়েস হয়েছে। তোমাদের দু'জনের এত কাছাকাছি হওয়া আর সর্বক্ষণ মেলামেশা লোকচোখে ভালো দেখায় না।

বিশুষ্ক মুখে রাগিণী বলেছিল, কেন মাসিমা, উনি তো আমার দাদা হন।

বিনোদিনী মাসি রাগিণীর একথায় আরো চটেছিলেন, আজ-কালকার মাসতুতো পিসতুতো দাদা দিদিদের পাঁচজনে ভালো চোখে ছাখে না।

শোভনামাসি শুনলেন সে-কথা। ননদের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে ঝাঁঝাল গলায় বললেন, তার মানে?

পাঁচজনে পাঁচকথা তো বলতে পারে দিদি।—বিনোদিনী দেবী গলার স্বর নামালেন।

পাঁচজনের পাঁচকথায় দরকার নেই। তোর নিজের কথা কি তাই বল।

আমার নিজের কথা আর কী বলব। তবে আগুন আর ঘি। বয়েসটা তো ভালো নয় দিদি। তুমি নিজেই বল না কেন!

আমি নিজে তো আর ছোটলোক নই যে ছোটলোকের মতন মন হবে আমার।—শোভনামাসির এ-কথায় বিনোদিণী দেবীও ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন, একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না দিদি। কী এমন অন্যায় কথা বলেছি?

অন্যায় নয়? রাগে বারুদফাটা হয়ে উঠেছিলেন শোভনামাসি। —তোর বাড়িতে ক'দিন আছি, তাই বলে কী এমনি করে অপমান করবি আমাদের?

বিনোদিনী দেবী ননদকে শান্ত করতে চাইলেন, তুমি অমন ভাবে কথাটা গায়ে মেখে নিচ্ছ কেন দিদি?

নেব না? চীৎকার করে উঠেছিলেন শোভনামাসি,—এক্ষুণি গাড়ি ডাকতে বলে দে। আমরা চলে যাব। এই মুহূর্তেই। তোদের এখানে আর জলস্পর্শ পর্যন্ত করতে চাইনে।

সে কী দিদি! আমি কী তোমাদের চলে যেতে বলেছি?

আর কী করে বলে শুনি?

তুমি অন্যায় রাগ করছ দিদি।

অন্যায় রাগ আমি করিনি। অন্যায় কথা বলেছিস্ তুই।

বিনোদিনী দেবী তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন, কী আর এমন অন্যায় কথা বলেছি? আপন জন ভেবে হিত কথাই তো বলতে চেয়েছিলাম।

শোভনামাসি বিরক্ত হলেন কোনটে হিত আর কোনটে অহিত —ওদের মতন লেখা পড়াজানা ছেলে মেয়ের সে জ্ঞান আছে।

লেখা-পড়াজানা ছেলে-মেয়েরো কী ভিন্ন জাতের? বয়েসেরও তো একটা ধর্ম আছে।

রাগে গর গর করে উঠলেন শোভনামাসি,—তা সে উপদেশ তোর নিজের ছেলেকে দিলেই পারতিস।

সেইদিনই সন্ধ্যার ট্রেনে রাগিণীকে নিয়ে শোভনামাসি কলকাতায় ফিরে চললেন।

যাবার সময় দৃপ্তকণ্ঠে তিনি ননদের কাছে গর্ব প্রকাশ করলেন আমার মেয়েও ফেলনা নয়, জানিস্। রীতিমত লেখা-পড়াজানা, তিনটে পাশ করা মেয়ে। ওর দাম কী কম? আর ওর উপযুক্ত পাত্র-কেনার সঙ্গতিও ভগবান আমাকে দিয়েছেন।

বিনোদিনী আর কথা বাড়ান নি। তিনি জানেন, কথায় কথা বাড়ে। আর শোভনাদির সঙ্গে এ নিয়ে অনেক কথাই তো বললেন। কিন্তু বাস্তবসঙ্গত বুদ্ধি তাঁর নেই। নিছক অন্ধ-স্নেহপ্রতিপালিতা রাগিণীর ওপর যে অনুরাগ তাতে তাঁর সঙ্গে কথায় টেক্কা দেওয়াও সহজ ব্যাপার নয়। অত গলার জোর তাঁর নেই! তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভালো। মন তাঁর শুধু স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল এই ভেবে যে রাগ, না লক্ষ্মী! সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। রাগিণী এখান থেকে চলে যাক্—মনে প্রাণে এই তিনি চাইছিলেন, শুধু আত্মীয়া শোভনাদির সঙ্গে মুখোমুখি এই বিরোধটুকু না হলেই ছিল ভালো।

ছল ছল করছিল পুলকেশের দুই চোখ। জীবনে তার প্রথম প্রেমের রোমাঞ্চ! এই বিচ্ছেদকে তার অসহনীয় বলেই মনে হয়েছিল।

তবু রাগিণী জানিয়েছিল তার মনের কথা। অকপটে সে তার মনোভাবকে প্রকাশ করেছিল পুলকেশের কাছে,—তোমার যদি সাহস

থাকে, তবে চলে এস আমাদের সঙ্গে। মাসিকে বলে আমিই সব ব্যবস্থা করে নেব।

পুলকেশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, হ্যাঁ, যাব। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। আর শুধু কয়েকটি মাস সবুর কর। বাবার অফিসের চাকরিটা আগে বাগিয়ে নিই। তারপর তুমি আর আমি আলাদা সংসার পাতব।

আশ্বস্তই হয়েছিল রাগিণী। কথার খেলাপ পুলকেশ করবে না। বাপ মা ত্যাগ করলেও পিছনে মাসির সাহায্য-অর্থ তারা ঠিকই পাবে। আর পুলকেশ তো চাকরি করবেই। বাপ-মা আর কতদিন রাগ করে একমাত্র ছেলে আর ছেলের বউকে ছেড়ে থাকবেন।

বমপাস টাউনে না হোক, দেওঘরের মধ্যে উইলিয়মস্ টাউনেই না হয় তারা ঘর ভাড়া নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে থাকবে! কিংবা বেলা বাগান। একেবারে নন্দন পাহাড়ের কাছাকাছি। ছোট্ট নন্দন পাহাড়টিও তার বড় ভালোলাগে। নন্দন পাহাড়ের শিলায় দু'লাইনের কবিতার ছন্দে পুলকেশের সঙ্গে তার নাম যুক্ত হয়ে আছে পাথরের টুকরো দিয়ে লেখা প্রেমের স্বাক্ষরে। আর রাগিণী যদি এখানে একটা মেয়েদের স্কুলে মাস্টারির চাকরি যোগাড় করে নিতে পারে তাহলে ছোট একখানি বাড়ি পুরোপুরি ভাড়া নেবে তারা দু'জন। বাড়ির নাম রাখবে কূজন।

উনিশ বছরের কুমারীমেয়ের কলেজী-জীবনের সে-প্রত্যাশা পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের কেরানি-জীবনে আজ আর নেই।

পুলকেশ 'মধুস্মৃতির' মায়া কাটাতে পারেনি। বাপের অফিসে পাকা চাকরি পাওয়ার পরই তার বিয়ে হয়ে গেছে। অপূর্ব সুন্দরী নাকি তার স্ত্রী!

শোভনামাসি আশ্বাস দিয়েছিলেন, দুঃখ করিস নে। ওর চেয়ে ঢের ভালো বরে তোর বিয়ে দিয়ে দেব।

ফ্যাকাসে হাসি হেসেছিল রাগিণী।

মাসি তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি।

রাগিণী তবু মুখ তুলে তাকাতে পারেনি।

শোভনামাসি সস্নেহে তাকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে পরম আদর মাখানো গলায় বলেছিলেন, অনেক টাকা রেখে গেছেন তোর মেসমশাই। ভাবনা কি তোর? টাকায় কী না হয় রে? কুরূপ পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া যায় চাঁদির তোড়ায়।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল রাগিণী।

আজ সে আবেক প্রত্যাশা পেয়েছে কাঞ্চনের কাছ থেকে, উড়ে এসে জুড়েই বসুন না কেন! কিন্তু জুড়ে বসার যোগ্যতা তার কোথায়? কী নিয়ে সে অহঙ্কার করতে পারে?

জীবন-দর্শন এখন তার দানা বেঁধেছে। অপরিপক্ক মন নেই আর। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের নারী-জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সে। ধূলি-ধূসরিত জীবনপথের যাত্রী। বাস্তব তার চোখ থেকে রঙিন চশমায় কাঁচ খুলে দিয়েছে,—কল্পনার রং কতটুকু আর রাঙিয়ে রাখতে পারে এখন? না, সে জানে তার জীবনের মূল্যমান। তার পরিবেশ কঠিন রাজপথ—এই মেঘ পাহাড়ের রঙিন ভূমি নয়। রূপ আর রূপা—যা নিয়ে মেয়েদের জীবনের অভিজাত্য, তার কোনটিরই অধিকারিণী সে নয়। কলকাতার পার্ক সাকার্সের অন্ধ কক্ষেই যথার্থ স্থান তার।

একটা গোটা অসহায় সংসার তাকে যত ক্লিষ্টই করুক না কেন তার বিত্তকে যে সম্মান দেয়, সে সম্মান আর কোন জায়গা থেকেই সে পেতে পারে না। তার উপার্জনকে ঘিরে একটা বুভুক্ষু সংসারের বেঁচে থাকার চাহিদা। তার জীবনের সত্যিকারের পাওনাকে পার্ক সার্কাসেই পেতে পারে। বিয়ের কথায় বাবা তাঁর কান দেন না।

শোভানামাসির মৃত্যুতে যে ক্ষতি হয়েছে তা কী সহজে মন থেকে মুছে ফেলা যায়।

শোভনামাসি বেঁচে থাকলে বিত্তবান জামাই হত তাঁর। আর ওই পার্কসার্কাসের সুরম্য বাড়িখানি—তাও তাঁর করতলগত হত নিশ্চয়ই। পরম নিশ্চিন্ততার মধ্যে শেষ বয়েসের দিনগুলি কাটাতে পারতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হল!

তাই আর ভুল করতে চান না সাত তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিয়ে। রাগিণীর পর ভামিনী। ভামিনী তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা। ভামিনী অন্তত মানুষ হোক্ আগে। ছেলেদের প্রতি কোন আস্থা নেই।

মা তবু মাঝে মাঝে রাগিণীর দিকে তাকান। নিজের নারীচিত্ত দিয়ে তিনি মেয়েকে বিচার করে দেখেন।

রাগিণীর বিয়ে দেওয়ার বয়েস হয়েছে। সংসারের স্বার্থে স্বামীর মতন এতখানি স্বার্থপর আর অন্ধ হতে পারেন না তিনি। স্বামীকে বলে বলে হার মেনেছেন। এখন রাগিণীকে ধরেছেন--বিয়ে থা করে এবার সংসারী হ।

মায়ের কথায় রাগিণী হেসে প্রশ্ন করেছে, পাত্র কই মা? কে তোমার এই কালোকুচ্ছিৎ মেয়েকে বিনা পণে বিয়ে করবে?

হাসির ছলে কথাটি বললেও রাগিণীর কথায় গুরুত্ব আছে। কিন্তু মা সে কথা ভেবে দেখেছেন বৈকি! ভেবে দেখেছেন এক্ষেত্রে স্বামীর মতনই স্বার্থগত ভাবনায়। মেয়ের রোজগারেই তাঁদের এই সংসারে দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান হয়। বিয়ে করে রাগিণী পরের ঘরে চলে গেলে পুরো সংসারে দুর্ভিক্ষ ডাকবে। তাই বহু বিচক্ষণতার সঙ্গে মেয়ের পাত্র নির্বাচন করেছেন তিনি। যে পাত্র শুধু পরের ঘরের ছেলে হয়ে জামাই হবে না। যে পাত্রকে তিনি নিজের ঘরে নিজের সংসারের একজন করেই ধরে রাখতে পারবেন। আর সেদিক থেকে শিশির ছেলেটি তো ভালোই।

রাগিণীর কথার উত্তরে তিনি তাই স্পষ্ট করেই জবাব দেন, কেন শিশির? শিশিরকে কি তোর পছন্দ হয় না?

মায়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রাগিণী বলে, তোমার বি-এ পাশ করা মেয়ের সঙ্গে ওই নন্‌ম্যাট্রিক ছেলের বিয়ে দেবে তুমি?

কেন দেব না। —শিশির না হয় কেতাবি লেখাপড়াই শেখেনি, কিন্তু সভ্য ভদ্র ছেলে। পৈত্রিক বাড়ি কলকাতায়। সচ্ছল অবস্থা। পাকা চাকরি করে,—আর তাও ভালো অফিসে। হুট্ করে চাকরি যাওয়ার ভয় নেই।

না, চাকরি খারাপ নয় ঠিকই। তবে এ চাকরি গেলে নতুন করে আর চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা নেই।

চাকরি না করলেও বাপের যা আছে তাতে সংসার অচল হওয়ার কথা নয়।

মায়ের কথার জবাবে রাগিণী বলে, সে অবস্থা তো আমার বাবারও ছিল। বাড়ি ঘর সম্পত্তি, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা। শেষকালে কী হল আমাদের? ভাগ্যিস্ আমার চাকরি হয়েছিল, তাই না।

রাগিণীর মতন এতখানি দূরদর্শিনী নন রাগিণীর মা। এত কথা তলিয়ে ভেবে দেখেননি তিনি কোনদিনই। তবু জবাব তাঁর আছে। বলেন, পার্টিশন হয়েই আমাদের এই অবস্থা। তা না হলে তো আমাদের কোন ভাবনাই ছিল না। এক্ষেত্রে তোর বাবার কথা ওঠে না। আর তুই তো সরকারি চাকরি করিস্। লেখাপড়া জানিস্। দিন দিন চাকরিতে উন্নতিই হবে। মাইনেও বাড়বে।

হ্যাঁ। তা সত্যি। কিন্তু আমার একার রোজগারে দু'টো সংসারের ব্যয় ভার চালানো অসম্ভব।

সে তো যদির কথা। অসম্ভবের ভাবনা অনেকটা।

অসম্ভবও সম্ভব হয় মা।—রাগিণী বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে।

তখন আমার ভাগ্যে যা আছে, তা হবে। তার জন্যে তুই কেন

সারা জীবন বঞ্চিত হয়ে থাকবি।—মায়ের চোখ দু'টি ছল ছল করে ওঠে।

রাগিণীও ভেবেছে শিশিরের কথা।

শিশির ইদানীং খুব আসা-যাওয়া করছে তাদের বাড়িতে। মাঝে মাঝে উপঢৌকনও নিয়ে আসে। আর রাগিণীর ওপর তার আকর্ষণও খুব বেশি। আবেদন জানিয়েছে, বিয়ের প্রস্তাবও করেছে।

কিন্তু ভারি ভাল ছেলে শিশির। লেখাপড়ার ধার ধারে না। আর্থিক সচ্ছলতা আছে। পার্ক সার্কাসেই পৈত্রিক দোতলা বাড়ি। ব্যাঙ্কে নিজের নামে বেশ উল্লেখযোগ্য ফিকসড্ ডিপোজিটে গচ্ছিত টাকা—যার সুদের অঙ্ক একেবারে উপেক্ষণীয় নয়।

শিশিরের নিজের মামা কোন এক মার্চেন্ট অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারি। মামার দৌলতেই শিশিরের পাকা চাকরি। মার্চেন্ট অফিসে আজকাল মাইনে পত্তরও ভালো। শিশির রাগিণীদের প্রতি বেশী। তার দাদারও প্রিয় বন্ধু।

দার্জিলিঙে আসার সময় শিশিরকে বলে এসেছে রাগিণী,—বিয়ের প্রস্তাবই ভেবে দেখার জন্যে যাচ্ছি। একটু নিরিবিলি ভেবে দেখতে চাই।

গদগদ কণ্ঠে আত্মহারা শিশির প্রশ্ন করেছিল, আমিও কি যাবো তোমার সঙ্গে দার্জিলিঙে?

না। তোমার তো দার্জিলিঙ দ্যাখা।

হ্যাঁ। রাগিণীর এ-কথা ঠিক। দার্জিলিঙ দেখে ম্যালের অনেক কথা আর কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্যকে ইনিয়ে-বিনিয়ে শিশির বলেছে।

রাগিণী সরাসরি না বলাতে শিশির মর্মাহত হল। তবু বলল, একলা দেখা আর তোমার সঙ্গে মিলেমিশে দেখা অনেক তফাৎ রাগিণী।

তবু রাগিণীর মন গলে না। বলল, আমি বড় ক্লান্ত শিশিরদা। কিছু মনে করো না, ক'দিন একটু একলা থাকতে চাই। তোমাকে

কথা দিচ্ছি—ফিরে এসেই আমার পাকা কথা তোমাকে নিঃসঙ্কোচে জানাব।

ভাবনাটা শেষ করে তাড়াতাড়ি ফিরে এস রাগিণী। আমি আর থাকতে পারছি নে। তুমি ছাড়া সত্যি বলছি—জীবন আমার অন্ধকার।—উচ্ছলতার আবেগের সুর শিশিরের কণ্ঠে।

প্রথমে শিশিরকে উপেক্ষাই করত রাগিণী।

শুধু লেখাপড়ায় সে যে শিশিরকে অনেক ডিঙিয়ে গেছে তাই নয়, মনের গঠনও তার অন্য রকমের। শিশিরের মধ্যে এমন কোন গুণ বা সংস্কৃতির ছাপ নেই যা নাকি রাগিণীর মতন উচ্চশিক্ষিতা মেয়ের মনকে স্পর্শ করতে পারে। অবিশ্যি মোটামুটি ভাবে শিশিরের চেহারাটি ভালো। গায়ের রং ফর্সা, দোহারা চেহারা, মাথার চুলগুলি সুবিন্যস্ত; কিন্তু বোকা বোকা চাউনি। তাই প্রেমিক হিসেবে শিশির রাগিণীর মনে কোন অনুরাগের দাগ টানতে পারে নি।

তবু শিশিরের ধৈর্য আছে। রাগিণীর অনেক উপেক্ষা আর উদাসীনতাকে সে গায়ে মাখেনি।

একদিনের ঘটনা বেশ স্পষ্টই মতন আছে রাগিণীর। শিশির যেদিন প্রথম নিজের হৃদয়ের প্রেমানুরাগকে মেলে ধরে তার কাছে—সেই সময়টির কথা।

কালবৈশাখীর অপরাহ্নে সেদিন দুর্যোগের ঘনঘটা—মেঘ এবং বিদ্যুতের দাপাদাপি। প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। কার্জন পার্কে ঝড়ো হাওয়ায় ধুলোর ঝড়। কড়্ কড়্ শব্দে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। অফিস থেকে বেরিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল রাগিণী। কোথায় একটু আশ্রয় নেয়।

অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে ঠিক সেই সময়ে শিশিরের দেখা। শিশিরই তাকে টেনে নিয়ে যায় চৌরঙ্গী কাফে-ডি-মনিকোতে। পাশা-

পাশি বসে একটি কেবিনের অভ্যন্তরে স্যাণ্ড-উইচ, কেক আর কফিতে আপ্যায়িত করে তাকে।

ঝড়ের পরে বৃষ্টি নেমেছে। প্রবল বর্ষণ। এই বৃষ্টি কখন যে থামবে তার কোন স্থিরতা নেই। আর এরপর কলকাতার রাস্তায় জল জমবে। যান-বাহন পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠবে। রাগিণী একটু চিন্তিতই হয়ে পড়েছিল।

এ-সমস্যার সমাধান শিশিরই করেছিল সেদিন। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে জলে ভিজে একটা ট্যাক্সি যোগাড় করে রাগিণীকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। শিশিরের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার কথাই রাগিণীর। কিন্তু মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল শিশির। চলন্ত ট্যাক্সিতে হঠাৎ সে যখন রাগিণীকে কাছে টানতে চায়—রাগিণীর কণ্ঠে তখন শাসনের সুর।

ট্যাক্সি থেকে বাড়ির দরজায় নেমে রাগিণীই ভাড়া মিটিয়ে দেয়। শিশিবের প্রবল বাধা দানকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নি,—না, কিছুতেই নয়। তোমার কাছে কোন ঋণ আমি রাখতে চাই নে।

শিশির মাথা হেঁট করে তার দুর্ব্যবহারের জন্যে অনুতাপ প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

তাবপর থেকে রাগিণী খুবই সতর্ক হয়েছে। শিশিরকে এড়িয়ে চলেছে। উপেক্ষা করেছে। কিন্তু নাছোড়বান্দা শিশির।

কাঞ্চনের ব্যবহারে, আচার-আচরণে ভদ্রতা সভ্যতা এবং আভিজাত্যবোধ অনেক বেশি। ভালোবাসার ক্ষেত্রে পুলকেশ এবং শিশিরের মতন কাঞ্চনের মধ্যে নগ্ন দেহবাদের কামনার হ্যাংলামি ভাব নেই।

'উড়ে এসে জুড়েই বসুন না কেন!' রাগিণীকে এই আশ্বাস দানের মধ্যে অনেকখানি মর্যাদার অভিব্যক্তি বুঝি প্রকাশ পায়।

শিশিরকে খুবই পছন্দ করেন রাগিণীর মা,—সত্যিই, লেখা-পড়া না শিখলেও এমন পরোপকারী ছেলে খুবই কম দেখা যায় আজকাল-কার দিনে। শিশির যে শুধু রাগিণীর প্রতিই অনুরাগী—তা নয়। আপদে-বিপদে সহায়-সম্পদে এ-সংসারের সে এক পরম হিতৈষীজন।

শুধু মুখের কথায় এবং ব্যবহারেই নয়,—অর্থ দিয়েও কম সাহায্য সে করে না এ-সংসারের। রাগিণীকে তা জানতে দেওয়া হয় না,—যে তেজস্বিনী মেয়ে সে! উপকারীকে উপযুক্ত সম্মান না দিয়ে হয়ত চরম অপমানের কথাই বলে বসবে। এ-নিয়ে দু'চারবার যে মা-মেয়েতে কথা কাটাকাটি হয়নি এমন নয়। শিশির বলতে মা তাই স্নেহ-বিগলিত হয়ে পড়েন,— ও আমাদের গত জন্মের আত্মীয় ছিল নিশ্চয়ই, তা না হলে এতখানি আপনজনের মতন হয় কেমন করে?

বাগিণীর বাবার মনোভাব কিন্তু তেমন নয়।

রাগিণী বিশ্লেষণ করে দেখেছে—সেটা তাঁর স্বার্থপরতা। শিশিরকে বিয়ে করে মেয়ে যদি পর হয়ে যায়, তার শ্বশুরবাড়ির দিকে মন দেয়—তা হলে এতগুলো অপোগণ্ড নিয়ে এ-সংসার চলবে কেমন করে? তার চেয়ে ভামিনীব সঙ্গে যদি শিশিবেব বিয়ে দেওয়া যায় সেটা বরঞ্চ লাভের।

নরম বিছানায় শুয়ে আপদমস্তক লেপমুড়ি দিয়ে বাগিণী এই কথাই ভাবছিল।

পায়ের তলার শক্ত মাটিকে বার বার অনুভব করছিল। চোখে ঘুম আসে না। বাইরের কাঁচের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে হিমালয়ের দৃশ্য।

পাহাড়ের মাথায় রং ধরেছে। মেঘের বিন্যাস। ঢেউ খেলানো-পাহাড়ের মাথায় কত বিচিত্র বর্ণের সমারোহ। কোথাও লাল, কোথাও নীল, কোথাও বা সাত রঙা রামধনু। আর নিচে থেকে রাশি রাশি সাদা মেঘের ফেনা পাকিয়ে পাকিয়ে ঊর্ধ্বলোকে উঠছে।

কাঞ্চনের একখানি হাত রাগিণীর করকমলকে স্পর্শ করে রেখেছে!—বলুন এইবার কালিম্পং কেমন লাগছে আপনার?

কী জবাব দেবে রাগিণী এ-কথার। নিচে থেকে ওঠা রাশি রাশি

সাদা সাদা তুলোয় পেঁজা বাষ্পগুলির দিকে তাকিয়ে সে শুধু জিগ্যেস করে,—ওগুলো কী। মেঘ?

না। ওগুলো ফগ।

কখন না জানি ঘুমিয়ে পড়েছিল রাগিণী।

তবে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জেগে ছিল। জেগে সে রাতের প্রহর গুণছিল। ওয়ালক্লকটায় মিষ্টিগানের সুরে সময়ের সঙ্কেতধ্বনি বেজে চলছে—রাত বারোটা, একটা, দুটো।

চোখের সামনে ভেসে উঠছে— কাঞ্চনের বৌদির বিরস মুখের ভাব —উড়ে এসে জুড়ে বসা।

মনে থেকে থেকে দ্বিধা জেগেছে। অস্বস্তি অনুভব করেছে সে— মীনাক্ষি সহজ মনে কেন তাকে গ্রহণ করতে পারছেন না। মাত্র একটি বেলার অবস্থিতিতেই তাঁর মনের ভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু কাঞ্চন তো তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে। সে এখানে দুচারদিন থাকলে বাধা কোথায়? কাঞ্চনের অতিথি হয়েই তো সে এ-বাড়িতে উঠেছে। কাঞ্চনই কথাপ্রসঙ্গে তাকে বলেছিল, মেয়েরাই মেয়েদের সহ্য করতে পারে না।

কথাটি এত খাঁটি আর এত তাড়াতাড়িই যে সত্যি বলে প্রমাণিত হবে আগে রাগিণী তা ঠিক অনুমান করতে পারেনি।

মীনাক্ষি অবিশ্যি বাহ্যতঃ কোন অসৌজন্যের ভাব মুখে ফুটে প্রকাশ করেন নি। তাঁর যা কিছু বক্তব্য তা তিনি নিজের দেওরকেই বলেছেন। রাগিণীর তাতে কী আসে যায়? ক্ষণিকের মেঘ। দু'দিনের অতিথি সে। দু'দিন বাদেই তো সে আবার চলে যাবে। তখন আর কারুরই মন ভার থাকবে না। আর কালই তো তপতী এসে পৌছবে। তপতী তার নির্দিষ্ট স্থানই অধিকার করে নেবে।

কাঞ্চন, তপতী আর মীনাক্ষি—কালিম্পং-এর এই মেঘ, পাহাড় আর রঙ। তার স্থান সেই সমতলভূমি। কলকাতার পার্কসার্কাসের

সেই অন্ধকার একতলার কারাগৃহ। শহরের রাজপথ, জনপ্রবাহ আর দৈনন্দিন সংসারের একটানা অভাব-অনটন, দারিদ্র্য আর অস্বাস্থ্য। ভাই দু'টির মধ্যে একটিও মানুষ হল না। দু'টি বোনকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব,—আবার এরই মধ্যে আর একটি শিশুর আবির্ভাব ঘটছে তাদের সংসারে। এইতেই ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, তারপর আবার—

নাঃ, ভাবনার আর অন্ত নেই রাগিণীর। গভরমেণ্টের দপ্তরের সিনিয়র গ্রেডের কেরানিগিরি তবু ভাগ্যক্রমে জুটেছিল তাই না রক্ষে।

দরজায় যেন করাঘাত শোনা গেল।

এরটি মধ্যে সবেমাত্র রাগিণীর চোখে ঘুম নেমেছে। চিন্তার আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে কখন না জানি ঘুমের গম্ভীরে তলিয়ে গিয়েছিল সে।

দরজায় মৃদু ধাক্কা দিয়ে কাজ হয় নি। নিচুগলার ডাকও শুনতে পায়নি রাগিণী।

কাঞ্চন বলল, থাক না হয় বৌদি। ঘুমোচ্ছেন, ঘুম ভাঙিয়ে আর কাজ নেই।

মীনাক্ষি বললেন, তাই কী হয়! আর একটু জোরে দরজায় ধাক্কা দাও, আরো জোরে ডাকো।

এতক্ষণে কাঞ্চনের ডাক শুনতে পেল রাগিণী। ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সে।

কী ঘুম আপনার! একেবারে কুম্ভকর্ণের ঘুমকেও হার মানিয়েছেন।

নাঃ, বিশ্রী ঘুম ঘুমিয়েছিল রাগিণী। লজ্জা পেয়ে গেল সে। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল, ছি ছি, ভারি অসুবিধেয় ফেলেছিলাম আপনাদের।

মীনাক্ষি দেবীই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, না, না, আর কথায় কাজ নেই

এখন। হাত মুখ ধুয়ে চট করে চায়ের টেবিলে এস। এরপর বেশি দেরি করলে তোমরাই ট্রেন মিস্ করবে।

তবু পরিহাস করতে ছাড়ল না রাগিণী, বেশ তো, সেবারে ট্রেন মিস্ করায় এলাম আমি। এবারে তপতী দেবী নিয়ে আসবেন—

কথার পিঠে কথা জুড়ে কাঞ্চন বলল, নাকেব বদলে নরুণ। কেমন তাই নয়?

মীনাক্ষি দেবীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাবারই কথা। রাগিণী বুদ্ধিমতী মেয়ে, বিছানা ছেড়ে উঠেই সে চট্ করে চলে গেল বাথরুমে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুখ হাত ধুয়ে বেশ-বিন্যাস সেরে চায়ের টেবিলে এসে বসল।

হাউ মিরাকেল! মাত্র পাঁচ মিনিটেই আপনি রেডি!

কাঞ্চনের কথার জবাবে রাগিণী বলল, ভুলে যাচ্ছেন কেন সপ্তাহে ছ'দিন যাদের রুজি-রোজগারের জন্যে টাইমলি অফিস যেতে হয় তাদের জীবনে স্পীড কত বেশি!

চা-জলযোগ সেরে কাঞ্চন আর রাগিণী মোটরে গিয়ে পাশাপাশি সীটে বসল। রামবাহাদুব প্রস্তুত ছিল। সেলফ্ স্টার্ট দিয়ে গিয়ারংটা টেনে দিতেই গাড়ি গর্জন করে উঠল। কিন্তু একী আশ্চর্য, বিছানা-পত্তর আর সুটকেশ—কিছুই যে সঙ্গে নিল না রাগিণী।

মীনাক্ষি দেবী এতক্ষণ নিশ্চিন্তই ছিলেন। হঠাৎ তাঁর হুঁস হয়। রাগিণীকে উদ্দেশ করে বললেন, তোমার বিছানাপত্তর আর সুটকেস।

ও এখানে থাক্ বৌদি!

বিস্মিতকণ্ঠে কাঞ্চন জিগ্যেস করল, তার মানে?

মীনাক্ষি দেবী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন, রাগিণী বলেছিল আজ সে কলকাতায় ফিরে যাবে।

রাগিণীর চোখে কৌতুক।

কাঞ্চনই জবাব দিল, তাই কী হয় বৌদি! দার্জিলিঙ না দেখিয়ে ওঁকে কলকাতায় ফিরতে দিচ্ছে কে? তপতীকে নিয়ে আমরা তিনজনই দার্জিলিঙ যাব।

মোটর ততক্ষণে স্টার্ট নিয়েছে।

মীনাক্ষি বিমূঢ়।

হেমন্তের কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রির শেষ প্রহরের অন্ধকার। ফীয়্যাটের হেড-লাইট জ্বলজ্বল করে জ্বলে আলোকিত করে রেখেছে পাহাড়ী পথ।

রাগিণী আরো কাছ ঘেঁষে কাঞ্চনের পাশে বসল।

সাত

শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে আবার সেই অরণ্যময় পার্বত্য প্রকৃতি।

শুধু কুয়াশার জাল। হেমন্তের শিশিরে বরফ জমেছে। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব।

মোটরের হেড লাইট জ্বেলে রামবাহাদুর মোটর ড্রাইভ করে চলেছিল। শীতটা হঠাৎ জাঁকিয়ে আক্রমণ করল রাগিণীকে। শুধু ওভারকোটে বাগ মানছে না। রাগিণীর দেহ কাঁপছিল। তার গায়ে শীতবাসের ওপর পশমের একটা গরম চাদর জড়িয়ে দিল কাঞ্চন।

এখন আর বিশেষ কথা নেই দু'জনের মধ্যে কারুর মুখে। রাগিণীর তো নয়ই।

কাঞ্চনই নীরবতা ভঙ্গ করল, কলকাতায় ফিরে যাওয়ার মতলব তা হলে ভেস্তে গেল।

রাগিণী নিরুত্তর।

যার জন্যে এতদূর আশা, তাকে না দেখেই চলে যেতে চাইছিলেন কেন?

রাগিণী তবু কোন উত্তর দিলনা।

কী হল আপনার?—কাঞ্চন অধীর ভাবে প্রশ্ন করল।

কই? কিছুই নয় তো!—শান্তকণ্ঠে রাগিণী এবার জবাব দিল।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। দু'জনেই দু'জনের সান্নিধ্য শুধু অনুভব করছে। কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে চুপচাপ করে থাকার ছেলে নয় কাঞ্চন। তার প্রকৃতিতে তারুণ্যের চঞ্চলতা। পাহাড় কেটে নগর তৈরী করে সে। সর্বক্ষণই কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। যন্ত্র আর জীবন। এরই মধ্যে দুটি দিনের ব্যবধান।

রাগিণীকে চুপ-চাপ থাকতে দেখে কাঞ্চন ভাবে অন্যকথা। কালিম্পং-এ বৌদির আচরণে হয়ত কোন অসৌজন্য প্রকাশ পেয়েছে। রাগিণী বুঝি অপমান বোধ করেছে সেজন্যে।

কাঞ্চন ত্রুটি স্বীকার করে বলল, অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে। এই শীতে ঘুম থেকে তুলে আর অনর্থক এই পথ যাত্রায়—

না, কষ্ট আর কী।—সংক্ষেপে জবাব দিল রাগিণী।

মুখে না বললেও মনে অসন্তুষ্ট নিশ্চয়ই হয়েছেন। ভোরের এই দিব্যি আরামের ঘুম ছেড়ে কে আর আসতে চায় বলুন? আমার না হয় গরজ। কিন্তু আপনার কী। আপনি কেন মিথ্যে মিথ্যে কষ্ট ভোগ করবেন? না। এ আমার ভীষণ অন্যায়। সত্যিই এক একটা জুলুম।

রাগিণী বুঝি কথাগুলি ঠিক শুনতে পায় নি। চোখ দু'টি তার বুঁজে এসেছে। গা খানিকটা হেলে পড়েছে কাঞ্চনের গায়ে। সত্যিই ঘুম পেয়েছে এখন রাগিণীর।

কাঞ্চন আরো পাশ ঘেঁষে সরে বসল। রাগিণীকে শুইয়ে দিল। মাথাটি কাঞ্চনের কোলেই থাক না কেন!

রাগিণী জেগে উঠল। লজ্জা পেয়ে গেল সে। ছি ছি, কী ঘুম-কাতুরে সে!

ও কী উঠে বসলেন কেন?

কাঞ্চনের কথায় রাগিণী বলল, আর লজ্জা দেবেন না।

লজ্জা পাবার কী আছে?

আপনাকে একটু বসবার জায়গা পর্যন্ত দিচ্ছি নে। এতটা স্বার্থ-পরতা তা বলে ভালো নয়।

না, না, সে কি! আমিই বরঞ্চ জুলুম করছি আপনার ওপর। ঘুম পেয়েছে আপনার। রাত্রে নিশ্চয়ই ঘুম হয় নি। এখন ঘুমানো দরকার।

কাঞ্চন রামবাহাদুরকে গাড়ি থামাতে বলল।

রাগিণী জিগ্যেস করল, গাড়ি থামালেন কেন?

আমি বসছি রামবাহাদুরের পাশে। আপনি আরাম করে শুয়ে পড়ুন।

রাগিণী কাঞ্চনের হাত চেপে ধরে বাধা দিয়ে বলল, না। কিছুতেই যেতে দেব না আপনাকে।

কেন মিথ্যে কষ্ট করবেন? এখনো অনেক পথ। একটু ঘুমিয়ে নিন।

আপনি চুপ করে বসুন তো।

কিন্তু কাঞ্চন সে-কথায় কান না দিয়ে মোটরের দরজা খুলে রাম-বাহাদুরের পাশে গিয়ে বসল।

সেবক ব্রীজের কাছে এসে মোটর থামল।

তখন আকাশ একটু ফর্সা হতে সুরু হয়েছে। কুয়াশার আবরণ আর ততটা নেই। রোদ উঠবে। হেমন্তের প্রভাতের সোনালী রোদে উভয়ের পূর্বরাগ।

রাগিণী ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘণ্টা দেড়েক সে বেশ আরামের ঘুম ঘুমিয়েছে। কাঞ্চনের ডাকে সে উঠে বসল। চোখ মুছে তাকাল কাঞ্চনের মুখের দিকে।

দেখুন, আপনার অতি প্রিয় তিস্তা।

রাগিণী তাকাল। বিস্ময় বিভূষিত চোখ মেলে সে তাকিয়ে দেখল, রূপালী তিস্তাকে। তরতর করে খরস্রোতা তটিনী বয়ে চলেছে।

কলস্রোতে কলতান। কান দিয়ে শুনতে হয়। সুন্দর দৃশ্য। চোখ যেন আর ফেরানো যায় না।

কাঞ্চন বলল, তিস্তাকে পাওয়া যায় কালিম্পং-এ, আর কাঞ্চনজঙ্ঘাকে পাওয়া যায় দার্জিলিঙে। ঘুম থেকে যখন দেখবেন সূর্যোদয়ের দৃশ্য তখন আপনি সত্যিই নিজেকে ভুলে যাবেন।

রাগিণী বলল, কালিম্পং-এ দেখেছি কাঞ্চনজঙ্ঘা। তাই বা কম কী? তার ছবিও মনে আঁকা রইল। কী সুন্দর দৃশ্য! কাঞ্চন যে এত সুন্দর তা চোখে না দেখলে কল্পনাও করা যায় যায় না।

হ্যাঁ। অনুভবের বিস্ময় ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তবে আসল কাঞ্চনের বেলাতেই একথা প্রযোজ্য।

নকল কাঞ্চন আবার কোথায় দেখলেন?

কেন, এই, এই তো। আপনার পাশেই রয়েছে।—নিজেকে দেখিয়ে কাঞ্চন মন্তব্য করল।

পরিহাস-কৌতুকে দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

কাঞ্চনের কথার সুর এবার পরিবর্তিত হল, এই একদিন মাত্র আপনার সঙ্গে মেলামেশায় অনুভব করছি—

কী অনুভব করছেন?

রাগিণীর কথায় কাঞ্চন তবু দ্বিধা প্রকাশ করল, বলব? ঠিক মনের কথাকে প্রকাশ করে বলব?

বলুন না।

ভরসা দিচ্ছেন?

স্মিত হাসি হেসে রাগিণী আশ্বাস দিল, নিঃসঙ্কোচে বলুন!

অনুরাগের আবেগ ভরা গলায় কাঞ্চন জানাল তার মনের ভাবকে, সত্যি, যদি আসল কাঞ্চন হতে পারতাম আপনার কাছে।

রাগিণীও নরম সুরে বলল, আসল নয়ই বা কেন কাঞ্চনবাবু? এ মুহূর্তে অন্তত আপনি আর আমি তো হৃদয়ের অতি কাছাকাছি

আছি। আমি যখন ভুলতে পেরেছি নিজেকে, নিজের দুর্ভাগা জীবনের হতাশা আর গ্লানি, সংসারের দারিদ্র্য—

কাঞ্চন বলল, আর আমি? আমার পাথর-চাপা ঐশ্বর্য যে কী দুর্বিসহ বোঝা তা যদি বুঝতেন রাগিণী দেবী—

রাগিণী থামিয়ে দিল কাঞ্চনকে। অস্ফুট কণ্ঠে সে শুধু বলল, Sing Riding's a Joy! For me, I ride.

আট

নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস একটু লেটই ছিল।

তবু রামবাহাদুর খুব জোরেই ড্রাইভ করে এসেছে। মীনাক্ষি দেবী আশঙ্কা করেছিলেন যে দেরি করে বেরিয়েছে ট্রেন ইন করার অনেক পরে হয়ত কাঞ্চন পৌঁছবে স্টেশনে। রাগিণীর ঘুম ভাঙাতে গিয়েই ওই কাণ্ড—কোত্থেকে এক উট্‌কো বিপত্তি এসে একদিনেই এই শান্তির সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করেছে। এখন ভালোয় ভালোয় আপদ বিদেয় হলে হয়।

কিন্তু না, ঠিক সময়েই কাঞ্চন আর রাগিণী শিলিগুড়ি এসে পৌঁছে গেছে।

রামবাহাদুর মোটরের দরজা খুলে দিল। কাঞ্চন আর রাগিণী গাড়ি থেকে নেমে স্টেশন প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়াল। দু'জনেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে।

আর কিছুক্ষণ বাদেই-তপতী এসে পৌঁছবে। তারপর তপতী আর কাঞ্চন—মেঘ আর পাহাড়। রাগিণী। রাগিণী তখন কী করবে?

স্তব্ধতা ভঙ্গ করল কাঞ্চন। বলল, কী ভাবছেন?

কিছু নয়।

একেবারে নির্লিপ্ত হয়ে গেলেন?

হ্যাঁ।

কালই কিন্তু আমরা দার্জিলিঙ যাব। দেখবেন,—কালিম্পং থেকে দার্জিলিঙের রাস্তারও কী সুন্দর দৃশ্য।

তাই নাকি।

সত্যিই আশ্চর্য নির্লিপ্ত ভাব এখন রাগিণীর মধ্যে।

ট্রেনের শব্দ শোনা গেল। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস এসে গেছে।

কাঞ্চন ব্যস্ত হয়ে উঠল। তপতী কই।

তন্ন তন্ন করে দেখল কাঞ্চন। তপতী আসে নি। অথচ এই ট্রেনেই তার আসার কথা। এবারে আর মিথ্যে বঞ্চনা নয়। অস্পষ্টতাও কিছু নেই।

তপতী আসে নি। কিন্তু তপতীর বার্তা নিয়ে এসেছে আর একজন।

নর্থ বেঙ্গলের সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট থেকে নেমে এল তপতীদেরই এক আত্মীয়। স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করল তপতীর না আসার কারণ।

তপতী আসতে পারে নি। কোনদিনই হয়ত সে আর আসতে পারবে না। আকস্মিক দুর্ঘটনা। ব্যবসায়ীর ফাটকাবাজারে তপতীর বাবা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন। ফার্ম লিকুইডেসনে চলে গেছে বাজারের দেনায়। কলকাতার বসত বাড়িটি পর্যন্ত ক্রোক পড়েছে। পর্বত প্রমাণ দেনা। চাপা লোক তপতীর বাবা। কাউকে ব্যবসার এই নিদারুণ অবস্থা বিপর্যয়ের কথা জানতে দেননি তিনি। কিন্তু এখন নিরুপায়।

তপতীই উদ্ধার করছে বিপন্ন বাপকে। যে সমাজে বিবাহ প্রথায় বরপণ প্রচলিত, সেখানে কন্যাপণের মোটা অর্থে তপতীর বাবা আবার ব্যবসা চালু রাখতে পারবেন—এমন ভরসা লাভ করেই তপতী আত্ম-বিক্রয় করতে রাজি বিবাদীর কাছে।

বহু অর্থের মালিক বিবাদীপক্ষ,—তপতীর বাবা তাঁরই কাছে ঋণগ্রস্ত। ব্যবসা-পত্তর এমন কি কলকাতার এমন সৌখীন বসতবাড়িটি পর্যন্ত ঋণের দায়ে বাঁধা। তপতী তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করছে।

পাত্রের বয়েস হয়েছে। সম্প্রতি বিপত্নীক। প্রথম পক্ষের ছেলে-মেয়েরা সাবালক। কিন্তু সবাই বাপের কর্তৃত্বাধীন। কলকাতা শহরের নামী ধনী। তপতীকে ভারি পছন্দ তাঁর। তপতীকে স্ত্রীরূপে পেলে ঋণ মকুবে কোন বাধাই আর থাকবে না। বাদীর কাছে বিবাদীই এই সর্ত আরোপ করেছেন।

হিমালয় পাহাড়ের প্রকাণ্ড একটা ধস কী ভেঙ্গে পড়ল কাঞ্চনের মাথায়? না, জগদ্দল পাথরের বোঝা চেপে বসল তার বুকে পিঠে? নিশ্বাসও স্তব্ধ হয়ে আসছে তার। দু'খানি চিঠি পাঠিয়েছে তপতী পত্রবাহকের হাতে। একখানি মীনাক্ষি দেবীর নামে। আর একখানি কাঞ্চনকে সম্বোধন করে। সংক্ষিপ্ত ভাষায় লেখা কাঞ্চনের নামে চিঠিখানি —

প্রিয় কাঞ্চন,

আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তোমার জীবনকে জড়াতে চাইনে। সংসারকে বাঁচাতে, পিতৃঋণ পরিশোধ করতে স্বেচ্ছায় আত্মবলি দিলাম। দুঃখ করো না। আশা করি ভবিষ্যতে যে তোমার জীবনে আসবে তাকে নিয়ে তুমি সুখী হবে। যেদিন যাওয়ার কথা ছিল সেদিন যেতে পারি নি। কেননা, সেদিনই আমার বিয়ের পাকা কথা দেওয়া হয়ে গেল। ভেবেছিলাম আজ সশরীরে গিয়ে সব কথা নিজের মুখেই তোমাকে বলব। তাই টেলিগ্রাম করেছিলাম, কিন্তু দুর্বলতা এমনই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে নিজে যেতে পারলাম না। আশা করি মার্জনা করবে।

ইতি
তপতী

স্থাণুর মতন দাঁড়িয়েছিল কাঞ্চন। যে-মুক্তি সে চেয়েছিল এই কিছুক্ষণ আগেও রাগিণীর পাশে বসে, আকস্মিক কোন মন্ত্রশক্তির বলে সে মুক্তি অসহ বোধ হচ্ছে তার? মেঘপাহাড়ের রঙের রাজত্ব থেকে সে এসে দাঁড়িয়েছে ধূলি-ধূসরিত জীবনের রাজপথে। আকাশ এখন কেমন

বিবর্ণ। যে-শক্তি পাহাড় কেটে নগব গড়ে, সে-শক্তি কোথায় এখন অবলুপ্ত

তপতীকে আবার কেন গভীর ভাবে মনে পড়ে?

আগন্তুক বললেন, আমাকে আবাব আসাম লিঙ্কেই ফিরে যেতে হবে কাঞ্চনবাবু। কিছু যদি বলবাব থাকে—

হ্যাঁ, বলবার আছে বৈকি! কাঞ্চনেব এতক্ষণে খেয়াল হল কিছু বলবার আছে তাব। না হয় রাগিণীরই পরামর্শ নেওয়া যাক্ না কেন। কাল তপতী না আসায় যেমন উদ্বিগ্ন হয়ে নানা আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছিল, ঠিক তেমনি ভাবে আজো কেননা জিজ্ঞাসা করা যাক্ কী কথা বলবাব আছে তাব।

কিন্তু আশ্চর্য! রাগিণী কই?

এ-পাশে, ও-পাশে, স্টেশন প্ল্যাটফরমের এ-ধারে ও-ধারে কোথাও রাগিণীব সন্ধান পাওয়া গেল না

রাগিণী কী তেমনি ভাবেই শিলিগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে ধূসর হিমালয়েব প্রতি আত্মনিমগ্ন হয়ে আছে?

না। তাও নেই।

রায়বাহাদুরেব তাগিদে দু'জনেই মোটবে গিয়ে উঠে বসল তপতীর আত্মীয় এবং কাঞ্চন।

কাঞ্চনের বিহ্বলতা দেখে একা তাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। আর আগন্তুকও অনুভব কবলেন, মীনাক্ষি যখন তপতীদের নিকট আত্মীয়া তখন তাঁর সঙ্গেও একবার পরামর্শ করে পরের দিনই না হয় কলকাতার ফেরা যাবে।

কাঞ্চন পুরুষ মানুষ। কর্তব্য তাকে স্থির কবে নিতে হল।

জীবন তো আব শুধু রং নয়। রাগিণীর মতন মেয়েরাও যেখানে অবিচলিত ভাবে জীবন-সংগ্রাম রত সেখানে জড়-বিজ্ঞানবিদ কাঞ্চন কেন হেরে গিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে?

শিলিগুড়ি থেকে আবার কালিম্পং-এর পথে মোটর ছুটে চলেছে।

ভোরের কুয়াশা কেটে গিয়ে সকালের রোদ ঝকমক করছে। কাঞ্চন একটা সিগার ধরিয়ে গভীর চিন্তায় আত্মনিমগ্ন।

সমতল ভূমি। দু'পাশে পাহাড় নেই। কিন্তু আরো কিছু দূর অগ্রসর হলে সেবক। তারপর পাহাড় আর অরণ্যশোভা—নিচে তিস্তার রূপালী রেখা।

আপনার নাম অবনীবাবু?

কাঞ্চনের প্রশ্নের উত্তরে আগন্তুক বললেন, হ্যাঁ। অবনী সরকার।

আপনি ও-বাড়ির?

দূর সম্পর্কে ৺পতীর কাকা। ওর বাবার ফার্মেই চাকরি করি।

হঠাৎ এ-দুর্ঘটনার কারণ?

ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট আর ইল স্পেকুলেশনস। শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে চক্রান্তও ছিল।

সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন তপতীর বাবা?

হ্যাঁ। যথাসর্বস্ব খুইয়েও মেজর পার্টনারশিপ রাখতে পারলেন না। তবে বর্তমান ফার্মের মেইন পার্টনার বিমলপ্রকাশবাবু সহায়ক হলে আবার উঠে দাঁড়াতে পারেন।

তিনিই কী -

হ্যাঁ তপতীর ভাবী স্বামী।

ও।

সেবক ব্রীজ পার হয়ে রামবাহাদুর আবার মোটরের স্পীড বাড়িয়ে দিল। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ। নিচে খদ, গভীর থেকে গভীরতর। কিন্তু কী নিপুণ ড্রাইভিং-এর হাত রামবাহাদুরের, তীর্যক গতিতে সে যান্ত্রিক-গাড়িকে নিয়ন্ত্রিত করে নিয়ে চলেছে।

কাঞ্চনের খেয়াল হল, এবার সে নিজে ড্রাইভ করবে। এই পাহাড়ী পথে হাতে স্টিয়ারিং নিয়ে সেও সমতল ভূমি থেকে সামনের

চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে চলবে। কানে এখনো সেই কণ্ঠস্বরের ব্যঞ্জন —Sing riding's a Jay for me, I ride. —

লিঙ্ক এক্সপ্রেসের থার্ডক্লাস কম্পার্টমেন্টে অসংখ্য যাত্রীর ভিড়। কোলাহল, কলরব আর ব্যস্ততা। জীবনের সেই প্রাত্যহিক সুর।

কলকাতার রাজপথেও এমনই ভিড়। বেলা দশটা-পাঁচটা কেরানি মহলের কর্মময় জীবনধারা। প্রয়োজনের তাগিদে শুধু ছুটে চলা।

এক্সপ্রেস ছুটে চলেছে।

একটির পর একটি স্টেশন পিছনে পড়ে থাকে। জীবনে এমনি অনেক স্টেশনই রাগিণী পার হয়ে এসেছে। পঁচিশ বছরের নারী-জীবনে কত স্টেশন এল আর গেল।

পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের সেই নদী-মেখলা গ্রাম, কলকাতার পার্ক-সার্কাসের শোভনামাসির সুশ্রী বাড়ি, দেওঘরে বমপাশ টাউনের 'মধুস্মৃতি' আর কালিম্পং-এর মেঘ-পাহাড়ের রং। এরপর। এরপর কী?

চলন্ত লিঙ্ক এক্সপ্রেসের থার্ড ক্লাশ ভিড়ঠাসা কম্পার্টমেন্টের এক অপরিসর সীটে বসে রাগিণী ভাবছে—কলকাতায় পৌঁছলেই শিশির এসে ঘিরে ধরবে তাকে। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক দীর্ঘশ্বাসে এবং আকুতিতে তার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলবে সে। ম্যাট্রিক ফেল করা পাত্র। তা হলেই বা! চাকরিটা তো ভালোই করে সে। বি-এ পাশ করা আপার গ্রেডের কেরানি রাগিণীর চেয়েও মাইনে তার আরো বেশি। বাপের খাস কলকাতা শহরে দোতলা বাড়ি, ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিটের জমানো টাকা।

মায়ের একান্ত ইচ্ছে শিশির জামাই হয়ে সন্তানতুল্য হৌক্ না এ-সংসারে। তাতে তো ষোল-আনাই লাভ!

রাগিণীও কী সেই কথাই ভাবছে এখন?

এই লেখকের

নিশিগন্ধা

মাটির পৃথিবী

অন্নকূট

কলরোল

উপনদী

সাগর আকাশ

একজন আর কয়েকজন

হৃদয়ে গোলাপ